সুমন্ত আসলাম

# hello ঠগবাজ

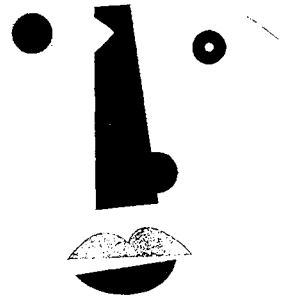

টিংকু আর সুমিত হঠাৎ করেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে–ঠগবাজি করবে তারা। এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার পেছনে হৃদয় হু হু করা একটা কারণ আছে। সেই কারণটা জানার আগে সবাই জেনে যাবে, তাদের ঠগবাজির বিভিন্ন কৌশল। কী অদ্ভুত আর বুদ্ধিমত্তার সাথে ঠগবাজিগুলো করেছে তারা। মাঝে মাঝে মনে হবে, এত সহজ ঠগবাজি করা! পরক্ষণেই মনে হবে–কী ভয়ঙ্কর, কী দুঃসাহসী!

এই ঠগবাজি করতে করতে একটা মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হয় ওদের। মেয়েটির নাম লিজা। মেয়েটাকেও ঠকিয়েছিল তারা। দুদিন পর মেয়েটা তাদের মেস বাড়িতে এসে উপস্থিত। একটা কাজ করে দিতে হবে তার। কাজটার কথা শুনে টিংকু বলে, 'কাজটা করা কঠিন কিছু না। তবে অনেক বুদ্ধি খরচ করতে হবে।'

'সে জন্যই তো আপনাদের খুঁজে বের করা।'

'কাজটা কবে শেষ করতে হবে?'

'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। তবে আজ থেকে কাজটা শুরু হবে। যতদিনই লাগুক এর জন্য আপনারা প্রতিদিন এক্সট্রা এক হাজার টাকা করে পাবেন।'

'না, ওই এক্সট্রা টাকা লাগবে না। আপনি আমাকে দুই লাখ টাকা দিতে চেয়েছেন, কিন্তু আমাকে দিতে হবে তিন লাখ টাকা।'

লিজা কোনো রকম চিন্তা বা দ্বিধা না করে বলল, 'ওকে, তিন লাখ। কোনো অগ্রীম লাগবে?'

'না। তবে দু-একটা জিনিস লাগবে আমাদের।'

ব্যাগ থেকে কাগজ আর কলম বের করে লিজা বলল, 'জিনিসগুলোর নাম লিখে দিন, রাতের মধ্যে পেয়ে যাবেন সবকিছু।'

বুদ্ধিমত্তা আর সফলতার সঙ্গে কাজটা করে দেয় টিংকু আর সুমিত।

তারপর জীবনটা পাল্টে যেতে থাকে তাদের। কিন্তু হঠাৎ করে তারা আরেকটা সিদ্ধান্ত নেয়। অন্যরকম সিদ্ধান্ত, অন্যরকম এক সিদ্ধান্ত।

সুমন্ত আসলাম

# hello ঠগবাজ

পার্ল পাবলিকেশন্স

banglabooks.in

তৃতীয় মুদ্রণ : একুশে বইমেলা-২০০৯
দ্বিতীয় মুদ্রণ : একুশে বইমেলা-২০০৯
প্রথম প্রকাশ : একুশে বইমেলা-২০০৯

©
লেখক

প্রচ্ছদ
সব্যসাচি হাজরা

ISBN–984-70162-0073-1

পার্ল পাবলিকেশন্স ৩৮/২ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে হাসান জায়েদী কর্তৃক
প্রকাশিত এবং মৌমিতা প্রিন্টার্স নয়াবাজার ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
অক্ষরবিন্যাস : সৃজনী ৩৮/২খ বাংলাবাজার ঢাকা।

মূল্য : ১৩০ টাকা

---

Hello Thogbaj, By Sumanto Aslam, Published By Hassan Zaidi, Pearl Publications,
38/2 Banglabazar, Dhaka-1100. Date of Publication February 2009. Price : 130 Tk. Only

E-mail : pearl_publications@yahoo.com
Website : www.allaboutbangladesh.com

তাঁর লেখা আমি যেদিন প্রথম পড়ি, সেদিনই তাঁর ভক্ত হয়ে যাই আমি। কী শব্দের ব্যবহার, ভাষার কারুকাজ! মাঝে মাঝে আমি অনেককে বলি, বাংলাদেশের সেরা রম্য লেখক তিনি।

তিনি এখন নাটক লিখছেন, রম্য নাটক, অন্য ধরনের নাটক। এখানেও তাঁর সফলতা, তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর।

## প্রিয় শায়ের ভাই, প্রিয় শায়ের খান

খুব দুঃখের সঙ্গে একটা কথা বলতে হচ্ছে আপনাকে—এত কিছু করছেন আপনি, কিন্তু আসল কাজটাই করছেন না। এখন আর লিখছেন না আপনি। এতে কেবল নিজেকে বঞ্চিত করছেন না, বঞ্চিত করছেন আমাদেরও!

banglabooks.in

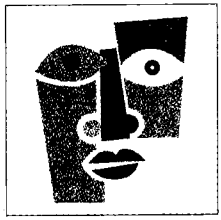

মুগ্ধ চোখে আমি টিংকুর দিকে তাকালাম। সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে ও। একদম চেনা যাচ্ছে না ওকে। কদম ফুলের পাপড়ির মতো ওর খাড়া খাড়া চুলগুলোতে হাত বোলাতে বোলাতে আমি আরো মুগ্ধ হয়ে যাই। ওর মোটা ভ্রূ দুটোও একটু চিকন করা হয়েছে, মেয়েরা করে সুতো দিয়ে টেনে; আর ও করিয়েছে ব্লেড দিয়ে চেঁচে। ভ্রূ দুটোর মাঝখানে জোড়া ছিল, সেখানেও চেঁচে ফাঁক করা হয়েছে। আর শজারুর কাঁটার মতো ঠোঁট ঢেকে যাওয়া যে গোঁফ ছিল ওর নাকের ঠিক নিচে, সেই জায়গাটা এখন চকচক করছে পিচঢালা হাইওয়ে রোডের মতো।

টিংকু ইশারা করল আমাকে। এবার আমার পালা। সেলুনে গিয়ে চেয়ারে বসার সঙ্গে সঙ্গেই একটা সমস্যা হয় আমার—ঘুমিয়ে পড়ি আমি। পুরো দেড় ঘণ্টা পরিশ্রম করে স্টাইল হেয়ার কাট সেলুনের লম্বা নাপিতটা আমাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে যা দেখাল, আয়নার ভেতর দিয়ে তা দেখে সমস্ত শরীর কাঁপিয়ে চমকে উঠলাম আমি। আমিই আমাকে চিনতে পারছি না! অন্য রকম এক আমি, আমূল বদলে যাওয়া এক আমি। শুধু আমার বাঁ গালে যে একটা মোটা কাটা দাগ আছে, সেটাই রয়ে গেছে আগের মতো।

সেলুন থেকে বের হয়ে টিংকু পকেটে হাত ঢুকিয়ে, সবগুলো পকেট চেক করে দুটো এক টাকার কয়েন আর একটা পাঁচ টাকার নোট বের করে বলল, 'তোর কাছে কত আছে?'

আমি আমার পকেটে হাত ঢোকালাম। গুপ্তধন খোঁজার মতো করে সমস্ত পকেট খুঁজে আমি একটা দুই টাকার কয়েন আর একটা দশ টাকার নোট বের করে বললাম, 'বারো টাকা।'

'আমার হাতে দে।'

বিনা বাক্য ব্যয়ে আমি আমার একমাত্র সম্পদ টিংকুর হাতে তুলে দিলাম। পূর্বের সমস্ত অবাক হওয়ার রেকর্ড ভঙ্গ করে টিংকু আমাকে নতুনভাবে অবাক করিয়ে ওর সাত টাকা আর আমার বারো টাকা হাতের মুঠোয় নিল, তারপর কোনো রকম দ্বিধা না করে মুঠোর ভেতরের সবকিছু ছুড়ে ফেলে দিল ময়লাপানি বয়ে যাওয়া পাশের ড্রেনের ভেতর। আমি চোখ বড় বড় করে দেখলাম, দুই টাকার কয়েনটা আর এক টাকার কয়েন দুটো টুপ করে ডুবে গেল। দশ টাকা আর পাঁচ টাকার নোট দুটো ভেসে যেতে লাগল ছেলেবেলায় কাগজ দিয়ে বানানো নৌকার মতো। বুকের একেবারে ভেতর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো আমার। টাকা-পয়সা যাদের বেশি আছে তারা বলেন, টাকা-পয়সা হচ্ছে হাতের ময়লা। হরেক রকম ময়লা ভেসে যাচ্ছে ড্রেন দিয়ে, বড়লোকদের হাতের ময়লা দশ আর পাঁচ টাকার নোট দুটোও ভেসে যাচ্ছে দুলে দুলে।

'এটা কী করলি তুই!'

টিংকু কিছুটা রেগে গিয়ে বলল, 'তুই কি চোখে কম দেখিস?'

'না।'

'তাহলে আমি যা করলাম তা তো দেখলিই।'

'কিন্তু—।'

হাত দিয়ে ইশারা করে টিংকু আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'যা করার তা করা হয়েছে। ও নিয়ে আর কথা বলতে রাজি না আমি। চল, কোনো হোটেলে গিয়ে আগে কিছু খেয়ে নিই।'

'খাব!'

'কেন, কোনো অসুবিধা আছে?'

'অসুবিধা নেই?'

'না, কোনো অসুবিধা নেই। আমি যা করব তা তুই চেয়ে চেয়ে দেখবি, যখন যা প্রয়োজন কেবল তা-ই বলবি। বাড়তি কিছু বলার দরকার নেই। ঠিক আছে?'

মাথা কাত করে আমি টিংকুকে সায় দিই। কিন্তু বুকের ভেতরটা কেঁপে ওঠে ধক্ করে। সারা শরীরে এত ব্যথা, আর কোনো ব্যথা সওয়ার জায়গা নেই।

ব্যাপারটা বুঝতে পারে টিংকু। ও একটু এগিয়ে এসে পরম মমতায় একটা হাত রাখে আমার পিঠে। টিংকুটা না কেমন জানি। যখন-তখন রেগে রেগে কথা বলবে, বোঝার উপায় থাকে না ওর ভেতর এত মায়া আছে, মানবতা আছে। একবার আমার খুব জ্বর হলো। কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। জ্বর কমার তো কোনো লক্ষণই নেই, সারা শরীর ধীরে ধীরে ব্যথা হয়ে যাচ্ছে। টিংকু ব্যাপারটা টের পেল। কাজকাম বাদ দিয়ে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল ও আমাকে। ডাক্তার আমাকে দেখে ওষুধ দিলেন আর বললেন দু ঘণ্টা পর পর মাথায় পানি ঢালতে। আশপাশে তো কোনো আত্মীয়স্বজন নেই আমার, মাথায় পানি ঢালবে কে? অগত্যা টিংকুই দায়িত্বটা হাতে নিল, তিন দিন আমাকে সেবা করে সুস্থ করে তুলল। কিন্তু পর পর তিন দিন অফিসে না যাওয়াতে চাকরিটা চলে গেল টিংকুর।

সুস্থ হয়েও মনটা খারাপ হয়ে যায় আমার। টিংকু সেটা খেয়াল করে আমাকে বলে, 'মন খারাপ করার কিছু নেই, চাকরি আরেকটা হয়ে যাবে। না হলে নাই। না খেয়ে থাকব। এ দুনিয়ায় প্রতিদিন কয়েক লাখ লোক না খেয়ে থাকে। তারা পারলে আমিও পারব।'

দেবদূতের মতো ওর কথা শুনে মনটা আরো খারাপ হয়ে যায় আমার। ও কাছে এসে পরম মমতায় একটা হাত রাখে আমার পিঠে, আজ যেমন করে রেখেছে ঠিক সেভাবে।

হোটেলের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে টিংকু বলে, 'একটা কৌতুক বলি তোকে। মনোযোগ দিয়ে শোন, মজা পাবি।' টিংকু আমার পিঠে হাত রেখে বলে, 'সিফাতকে তার বন্ধু মিথুন জিজ্ঞেস করে—তোর না রিচির সঙ্গে এনগেজমেন্ট হয়েছিল?

হ্যাঁ, হয়েছিল। সিফাত কিছুটা মন খারাপ করে বলে।

এভাবে বলছিস কেন? তোদের এনগেজমেন্টটা কি ভেঙে গেছে?

সিফাত আগের চেয়ে মন খারাপ করে বলে, হ্যাঁ।

মিথুন অবাক হয়ে বলে, কেন?

ও আমাকে পরে বিয়ে করতে চায়নি।

মিথুন আগের মতোই অবাক হয়ে বলে, কেন?

আমার তো তেমন টাকা-পয়সা নেই, তাই।

তোর নেই তো কী হয়েছে, তোর চাচার আছে না? তুই রিচিকে তোর সেই ধনী চাচার কথা বলিসনি?

বলেছিলাম। এর পরই তো ও আমাকে বাদ দিয়ে আমার চাচাকে বিয়ে করেছে, ও এখন আমার চাচি হয়েছে।' টিংকু আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলে, 'আরেকটা শুনবি?'

হাসি হাসি মুখ নিয়ে আমি টিংকুর দিকে তাকাই। ও যে কত মজার মানুষ, তা ওর সঙ্গে না মিশলে বোঝা যায় না। আমরা যে জায়গায়টায় কাজ করতাম, সেখানে পাকিস্তানি, ভারতীয়, সুদানি, নাইজেরিয়ানরা কাজ করত। স্বাস্থ্য ও শক্তির দিক দিয়ে নাইজেরিয়ানরা এমনিতেই এগিয়ে, আমরা সবাই ওদের ভয়ও পেতাম। আমাদের মালিক সপ্তাহে এক দিন বিকেলে নাশতা দিতেন সবাইকে। প্যাকেট-নাশতার ভেতর আপেল, আঙ্গুর, আমাদের পুরির মতো এক ধরনের পরোটা থাকত। তিনি সবার জন্য গুনে গুনে নাশতার প্যাকেট পাঠাতেন। একদিন একটা প্যাকেট কম পড়ল। কিন্তু তখন প্যাকেট নেয়া বাকি ছিল উড়ুসের আর টিংকুর। উড়ুস আবার ছিল নাইজেরিয়ান। স্টুয়ার্ট, মানে যে প্যাকেট বিতরণ করছিল, ও পড়ে গেলে বিব্রতকর অবস্থায়। তা দেখে টিংকু এগিয়ে গিয়ে বলল, 'স্টুয়ার্ট, আমার একটা প্রস্তাব আছে।'

স্টুয়ার্ট আশাবাদী হয়ে বলল, 'বলো বলো।'

'নাশতার প্যাকেট রয়েছে একটা। হয় সেটা আমি পাব, নাহয় উড়ুস পাবে। কিন্তু কে পাবে, সেটা বাছাই করা মুশকিল হচ্ছে। যেহেতু মানুষ আমরা দুজন, সেহেতু আমাদের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা হতে পারে।'

'কী রকম প্রতিযোগিতা?' স্টুয়ার্টকে পাশ কাটিয়ে উড়ুস সামনের দিকে এগিয়ে আসে।

'আমরা একজন আরেকজনের নাকে একটা ঘুষি দেব। যে সেই ঘুষি খেয়ে সবচেয়ে কম সময়ের মধ্যে উঠে দাঁড়াতে পারবে, সে-ই হবে ওই নাশতার প্যাকেটের মালিক।' টিংকু বেশ সাহসী হয়ে বলে। কিন্তু আমার বুকের ভেতরটা একেবারে ঠান্ডা হয়ে যায়। আশপাশে যারা ছিল তারা খুব উৎসাহী হয়ে ওঠে। তবে সবচেয়ে বেশি উৎসাহী হয়ে ওঠে উড়ুস। অবজ্ঞার একটা হাসিও ফুটে ওঠে ওর ঠোঁটের কোনায়। আমি খেয়াল করে দেখি,

আনমনে ও ডান হাতটা মুঠি করে মোচড়াতে থাকে। কালো কুচকুচে প্রায় আট ইঞ্চি চওড়া হাতের মুঠিটা দানবের মুঠির মতো মনে হয় আমার কাছে।

স্টুয়ার্ট এগিয়ে এসে উডুসকে বলে, 'কী, তুমি রাজি?'

ঠোঁটের কোনায় অবজ্ঞার হাসিটা ধরে রেখেছে উডুস। হাসিটা আরো বাড়িয়ে টিংকুকে চোখের কোনা দিয়ে ইশারা করে দেখিয়ে স্টুয়ার্টকে বলে, 'ওকে জিজ্ঞেস করো, কে আগে ঘুষি মারবে?'

স্টুয়ার্ট কিছু বলার আগেই উডুসকে টিংকু বলে, 'তুমিই বলো।'

অবজ্ঞার চরম পর্যায়ে টিংকুকে নামিয়ে এনে উডুস পাহাড়ের মতো সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলে, 'তুমিই মারো।'

টিংকু ডান হাতটা মুঠি করে। মুখের কাছে এনে অল্প একটু থুতুও ছিটায় সেই মুঠিতে। তারপর উডুসের দিকে এগিয়ে গিয়ে ওর নাক বরাবর প্রচণ্ড শক্তি প্রয়োগ করে একটা ঘুষি মারে। উডুসের মাথাটা ইঞ্চি দুয়েক পেছনে সরে আসে। মাত্র তিন-চার সেকেন্ড। এর পরই আবার পাহাড়ের মতো সোজা হয়ে দাঁড়ায় উডুস, যেন একটা ছোট মাছি ওকে ডিস্টার্ব করছিল, মাথাটা পেছনে নিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে সেটাকে।

হাতের মুঠি পাকাতে শুরু করেছে উডুস। আমি আমার নিজের হৃৎপিণ্ডের শব্দ নিজেই শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু টিংকুর দিকে তাকিয়ে দেখি, ও হাসছে, চোখমুখ প্রসারিত করে হাসছে।

ঘুষিটা মারার পর তিন পা পিছিয়ে এসেছিল টিংকু। উডুস এক পা এগিয়ে যায় ওর দিকে। মুখে অবজ্ঞার হাসিটা ফুটে উঠেছে আবার। আরো এক পা এগিয়ে যায় সে। বুকের ভেতরটা একটু শব্দ করে কাঁপতে থাকে আমার। তৃতীয় পা'টা এগোনোর আগেই স্টুয়ার্টের হাত থেকে নাশতার প্যাকেটটা নিয়ে উডুসের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে টিংকু বলল, 'ঠিক আছে, তোমার শরীর-স্বাস্থ্য বড়, তোমার খাবার দরকার বেশি, সুতরাং খাবারটা তুমিই খাও।'

উডুস হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। প্রচণ্ড আশাবাদী হয়ে উঠেছিল সে—খুব মজা করে একটা ঘুষি মারবে টিংকুর নাকে। সেটা মিস হয়ে যায়। চোখেমুখে রাগ ফুটিয়ে হাতের মুঠিটা আলগা করতে থাকে উডুস। টিংকু আগের মতোই হাসতে হাসতে আমার একটা হাত ধরে ওখান থেকে সরে এসে ফিসফিস করে বলে, 'অনেক দিনের ইচ্ছে ছিল একটা নাইজেরিয়ানের নাকে ইচ্ছেমতো ঘুষি দেব। যাক, বহুদিনের একটা ইচ্ছা পূরণ হলো।' টিংকু

ফিসফিস করে কথা বলার মতো খ্যাস খ্যাস করে হাসতে থাকে।

হোটেলের সামনে এসে টিংকু বলল, 'কথাটা মনে আছে তো তোর?'

'কোন কথাটা?'

'এরই মধ্যে ভুলে গেলি! আমি যা করব তা তুই শুধু চেয়ে চেয়ে দেখবি, যখন যা প্রয়োজন কেবল তা-ই বলবি। বাড়তি কিছু বলার দরকার নেই। ঠিক আছে?'

আগের মতো মাথা একদিকে কাত করে সায় দিলাম আমি টিংকুকে, মুখ দিয়ে কোনো কথা বের হচ্ছে না আমার।

হোটেলের ভেতর ঢুকেই ভালো একটা জায়গা বেছে নিয়ে সেখানকার টেবিলটাতে বসল টিংকু। অন্যপাশে আমাকে বসতে বলল ইশারায়। বয় কাছে আসতেই টিংকু বলল, 'খাবার কী কী আছে?'

তোতাপাখির মতো গড়গড় করে খাবারের তালিকা বলে গেল বয়টা। টিংকু তা শুনে মুচকি হেসে বয়কে বলল, 'এই যে এত ভালো ভালো খাবারের নাম বললে, তুমি তো মানুষকে সার্ভ করো এসব, তুমি কখনো খেয়েছ এসব খাবার?'

'না।'

'তোমার খেতে ইচ্ছে করে না?'

'করে।'

টিংকু আমার দিকে তাকিয়ে বলে, 'পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষই হচ্ছে এ রকম। এক তলা থেকে শুরু করে একশ তলা বিল্ডিং বানান যে মিস্ত্রিরা, তারা কখনো ওই ধরনের বিল্ডিংয়ে থাকতে পারেন না, তারা থাকে সাধারণ ঘরে। ক্ষেত-খামারে যারা সুন্দর সুন্দর ফসল ফলান পরিশ্রম করে, তাদের কুঁড়েঘরের বাড়িতে কখনো সেই ফসলগুলো যায় না, পাথর-লোহার তৈরি বাড়িতে সেগুলো পৌঁছে যায় অর্থের জোরে। এই যে যারা ভালো ভালো কাপড় বোনেন, তারা অনেক সময় ছেঁড়া কাপড়চোপড় পরে থাকেন। সবকিছুই করে একজন, ভোগ করে আরেকজন।' টিংকু বয়টার দিকে তাকায়, 'যাও, তোমার ইচ্ছে অনুযায়ী ভালো কিছু নাশতা নিয়ে আসো।'

পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যে বেশ কয়েক রকম নাশতা নিয়ে আসে বয়টা। নাশতার সুবাসে পেটের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে আমার। কত দিন এ রকম খাবার খাই না! টিংকু আমাকে ইশারা করে খাওয়া শুরু করতে। আমি

টিংকুর দিকে তাকাই, ও শুরু করেছে। আমি নাশতার প্লেটে হাত দিই, কিন্তু হাতটা থেমে যায়। খাবার আর হাতে নিতে সাহস হয় না, মুখে নেওয়া তো তারপর। অথচ পেটে প্রচণ্ড ক্ষুধা।

খুব মনোযোগ দিয়ে খাচ্ছে টিংকু, একটু দ্রুতই খাচ্ছে। খাবেই তো, ভালো খাবার তো দূরের কথা, গত দেড় বছর আমরা পেটপুরে খেয়েছি কি না, তা মনে পড়ে না আমার। খেতে খেতে টিংকু একবার আমার দিকে তাকায়। সঙ্গে সঙ্গে খাবার চিবুনো বাদ দিয়ে ইশারা করে চোখ দিয়ে, একটু রাগও করে ও।

ভীষণ সংকোচ আর দ্বিধা নিয়ে এক টুকরো খাবার মুখে দিই আমি। খাবারটা মুখেই থাকে, পেটের ভেতর আর যায় না। অনেকক্ষণ মুখে রাখার পর আস্তে আস্তে চিবুতে চিবুতে খাবারটা পেটের ভেতর নিই। তারপর আরো কয়েক টুকরো। আর সম্ভব হয় না আমার। পেটটা কেমন যেন ভরে ওঠে আপনা-আপনি।

'কিরে, কিছুই তো খেলি না!'

'খেতে ইচ্ছে করছে না।'

টিংকু আমার দিকে গভীরভাবে তাকায়। তারপর ফিসফিস করে বলে, 'তুই এখনো আমার ওপর বিশ্বাস রাখতে পারছিস না!'

'না, ঠিক বিশ্বাস না। কেমন যেন লাগছে।'

'কেন, কেমন লাগছে?

'তাও জানি না।'

টেবিলের ওপর রাখা আমার হাতের ওপর টিংকু ওর একটা হাত আলতো করে রেখে বলে, 'ভয় পাচ্ছিস?'

মাথা নিচু করে ফেলি আমি। গত তিন বছরের পরিবেশ, পারিপার্শ্বিকতা শুধু ভীতই বানায়নি, কেঁচো বানিয়ে ফেলেছে আমাকে। নিজেকে এখন মানুষ পরিচয় দিতে লজ্জা হয়। মানুষের তো মেরুদণ্ড থাকে, মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, আমার কোনো মেরুদণ্ডও নেই।

'ভয় পাচ্ছিস কেন?'

মাথাটা সামান্য উঁচু করে আমি বলি, 'খাওয়ার পর কী করবি?'

'সেটা তোকে ভাবতে বলেছে কে? আমি তোকে কী বলেছি! আমি যা করব তা শুধু চেয়ে চেয়ে দেখবি। প্রয়োজন হলে দু-একটা কথা বলবি। নে,

খা। খাওয়ার পর কী করব, সেটা আমি দেখব।'

টিংকু জোর করে আমাকে খেতে বলে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি আরো একটু মুখে নিই, কিন্তু গিলতে পারি না। মনে হচ্ছে গলার কাছে কী যেন আটকে আছে আমার।

বয়টা আবার এসে উপস্থিত। টিংকু খাওয়া শেষ করে ওকে বলে, 'কফি আছে?'

'আছে।'

'দু কাপ কফি নিয়ে আসো।'

কফি আনতেই টিংকু এমনভাবে খেতে লাগল, মনে হচ্ছিল ওর মতো সুখী আর নিশ্চিন্ত মানুষ এ পৃথিবীতে আর একটিও নেই। আমি মুগ্ধ হয়ে দেখছি, কী আশ্চর্য রকমের একটা মানুষ!

কফি শেষ করেই টিংকু বয়কে ডেকে বলল, 'টুথপিক আছে?'

বয় টুথপিক এনে দিল। দাঁত খোঁচাতে খোঁচাতে খাওয়ার টেবিল থেকে উঠে এসে হোটেল ম্যানেজারের কাউন্টারের সামনে দাঁড়াল টিংকু। ম্যানেজার টাকা গুনছিলেন। মাথা উঁচু করে তিনি টিংকুর দিকে তাকালেন। টাকা গোনার জন্য তিনি আবার মাথাটা নিচু করতে নিতেই কেমন যেন থমকে গেলেন। টিংকুর দিকে ভালো করে তাকিয়ে বললেন, 'কিছু বলবেন আপনি?'

দু ঠোঁটের মাঝখানে টুথপিকটা চেপে ধরে টিংকু বলল, 'আমাকে চিনতে পেরেছেন?'

ম্যানেজার কিছুটা ইতস্তত করে বলল, 'ঠিক— ।'

'দেড় বছর আগে আমি একবার আপনার এই রোস্তোরাঁয় এসেছিলাম।' টিংকু টুথপিকটা এবার হাতে নিল।

'তাই নাকি!'

'সেদিনও খাবারগুলো ভালো ছিল।'

'জি, আমাদের এখানে খাবারগুলো ভালোই রান্না হয়।'

'সেদিন বেশ তৃপ্তি নিয়ে খেয়েছিলাম।'

'থ্যাংকু স্যার।'

'কিন্তু সেদিন একটা জিনিস দিতে পারিনি আপনাদের।'

'কী জিনিস স্যার?'

'খাবারের বিল। সেদিন খাবারের বিল হয়েছিল বিয়াল্লিশ টাকা। আর এই

বিয়াল্লিশ টাকার জন্য আপনি আপনার বেয়ারাদের দিয়ে আমাকে মেরে, অপমান করে, বের করে দিয়েছিলেন হোটেল থেকে।'

'স্যরি স্যার। আমাকে ক্ষমা করবেন। সেবার ভুল হয়ে গিয়েছিল।'

'ক্ষমা! ক্ষমার কথা আসছে কেন? না না, ক্ষমার কিছু নেই। আপনি আপনার সব কর্মচারীকে ডাকুন, ওরা আজও আমাকে মেরে, অপমান করে, বের করে দিক এই হোটেল থেকে।'

'কেন?' ম্যানেজার সাহেব অবাক ও লজ্জিত ভঙ্গিতে বললেন।

টিংকু আবার দাঁত খোঁচাতে খোঁচাতে বলে, 'আজও আমার কাছে কোনো টাকা নেই!'

চোখ ছানাবড়া হয়ে গেছে ম্যানেজার সাহেবের। তিনি আগের চেয়েও বেশি অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন টিংকুর দিকে। কিন্তু টিংকু নির্বিকার। বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর তিনি চিবিয়ে চিবিয়ে টিংকুকে বললেন, 'বাসায় যাওয়ার টাকা আছে তো?'

'না, নেই।'

পঞ্চাশ টাকার একটা নোট বের করে ম্যানেজার সাহেব টিংকুর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'এটা নিন, তারপর সিএনজি কিংবা রিকশায় করে বাসায় যান।'

নির্দ্বিধায় নোটটা হাতে নিল টিংকু। তারপর সেটা পকেটে রাখতে রাখতে মুচকি হেসে ম্যানেজার সাহেবকে বলল, 'থ্যাংক ইউ।'

হোটেল থেকে বের হয়ে আসছি আমরা। এমন সময় পেছন থেকে কে যেন বলল, 'শালা!'

ঘুরে দাঁড়াল টিংকু। সোজা ম্যানেজার সাহেবের কাউন্টারের সামনে গিয়ে বলল, 'এত দেরিতে চিনলেন! শালাই তো। আর শালারা তো দুলাভাইয়ের হোটেলে ফ্রি-ই খায়।'

হোটেল থেকে বের হয়ে এলাম আমরা। রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে টিংকু হঠাৎ দাঁড়িয়ে বলল, 'আমাদের হাতে এখন পঞ্চাশ টাকা আছে। এটা দিয়েই শুরু করতে হবে। এর আগে নতুন একটা কাজ করতে হবে আমাদের।'

'কী কাজ?'

'কাজটা হয় তুই প্রথমে করবি, নাহয় আমি। তবে কাজটা আগে আর পিছে দুজনকেই করতে হবে।'

'কাজটা কী?'

'একটু কঠিন কাজ।'

'আমরা গত তিন বছর যা করেছি, এর চেয়ে কঠিন কাজ?'

'এর চেয়ে কঠিন।'

'বল।'

টিংকু একটু সময় নেয়। চোখমুখ লাল হয়ে যাচ্ছে ওর। ওকে তো আমি চিনি, ও খুব কষ্ট পাচ্ছে। বেশ কিছুক্ষণ পর বুক টানটান করে ও সোজা হয়ে বলল, 'আমার পাছায় জোরে একটা লাথি মার তুই, তারপর আমি তোর পাছায় মারব।'

'কি!'

'আমি যা বলেছি, তা শুনতে পাসনি তুই?'

'শুনেছি। কিন্তু এটা কী করে সম্ভব!'

'সম্ভব।' টিংকু চোখমুখ লাল করে বলল, 'কয়েক বছর ধরে যে যেভাবে পেরেছে আমাদের পাছায় লাথি মেরেছে। কেবল তোর পাছায় আমি মারিনি আর আমার পাছায় তুই মারিসনি। সবাই মারল, আমরাই বা বাকি থাকি কেন! আমরা তো অন্য কারো পাছায় লাথি মারতে পারব না, তাই আমার পাছায় তুই মারবি আর তোর পাছায় আমি মারব। জীবনের একটা অপূর্ণ স্বাদ অন্তত মেটানো হবে। নে, শুরু কর।'

টিংকুর দিকে এগিয়ে যাই আমি। চোখ দুটো ছলছল করে ওঠে আমার। তা দেখে টিংকু প্রচণ্ড চিৎকার করে বলে, 'খবরদার, চোখে পানি আনবি না। গত কয়েক বছর চোখের পানি অনেক সস্তা করে ফেলেছি, আর না।' কথাটা বলে টিংকু নিজেই কেঁদে ফেলে। চোখ দিয়ে ধীরে ধীরে পানি পড়ছে, আর ডুকরে ডুকরে উঠছে ও। হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে চোখ মোছার চেষ্টা করে টিংকু। সঙ্গে সঙ্গে আবার চমকে উঠি। ওর হাতের উল্টোপিঠের দগদগে ঘা'টা আরো লাল হয়ে গেছে। এ রকম আরো কয়েকটা ঘা আছে ওর শরীরে, আছে আমার শরীরেও। সেই ঘাগুলোর ব্যথায় আমরা মাঝে মাঝেই চিৎকার করে উঠি। কোনো কোনো রাত না ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিই বিছানায় ছটফট করে।

চোখ মুছতে মুছতে টিংকু বলে, 'ব্যাগ দুটোও ফেলে দেব।'

আমি আমার দু কাঁধে রাখা টিংকুর আর আমার ছোট ব্যাগ দুটো চেপে ধরে বলি, 'কেন, এর ভেতর তো আমাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আছে।'

'শুনি, কী কী প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আছে? আছে তো পুরোনো শার্ট, প্যান্ট, টুথব্রাশ, চিরুনি।' টিংকু একটু থেমে গলাটা বিষাদ করে বলে, 'আমরা শূন্য হয়ে গেছি, সুমিত, না?'

'না, শূন্য করা হয়েছে আমাদের?'

'করা হয়েছে— ।' টিংকু মনে মনে কী একটা ভেবে বলে, 'যা-ই হোক, শূন্য এই আমরা আবার শূন্য থেকেই শুরু করতে চাই, একেবারে শূন্য থেকে। তবে একটু অন্য ভাবে।'

'অন্য ভাবে!'

'হ্যাঁ, অন্য ভাবে।' বলেই কোনো রকম মায়া, কোনো রকম দ্বিধা না করে, চারদিকে ময়লা উপচে পড়া পাশের ডাস্টবিনটার ভেতর ব্যাগ দুটো ছুড়ে ফেলে দেয় টিংকু।

মুখের ভেতর বাঁ কোনার দিকে পুরো একটা আঙুল ঢুকিয়ে চিবুনো কিছু পান বের করে লোকটা একটু দেখলেন, তারপর ওই পানটুকু আবার মুখে ঢুকিয়ে চিবুতে চিবুতে বললেন, 'তা বলেন, কী খেদমত করতে পারি আপনাদের।'

'এই বাড়িটা তো আপনার।' টিংকু বলল।

'জি, আল্লাহ পাক দিছেন।' চেয়ারের ওপর পা তুলে বসলেন তিনি।

বাড়িটার দিকে তাকালাম আমি। ঠিক বাড়ি মনে হচ্ছে না, ছোটখাটো একটা গুদামঘর মনে হচ্ছে এটাকে। চারদিক দেয়ালঘেরা, ওপরে টিন লাগানো পুরো বাড়িটা। মাঝখানে ছোট ছোট দেয়াল দেয়া। সারা বাড়িতে একটা জানালাও নেই, একেবারে বন্ধ, গুমোট।

'আমরা আপনার বাড়িটা ভাড়া নিতে এসেছি।'

'ভাড়া নিবেন? কয় রুম লাগব আপনাদের?'

'জি, একটা রুম হলেই চলবে।'

বাড়িওয়ালা চিৎকার করে মফিজ নামের একজনকে ডাকলেন। লোকটা কাছে আসতেই তিনি আবার মুখের ভেতর আঙুল ঢোকালেন, চিবুনো পান বের করলেন, মুখে পুরলেন, তারপর বললেন, 'মফিজ, কোনো রুম খালি আছে নাকি রে?'

'জে না সাব।'

'খালি নাই? কিন্তু ওনাদের তো রুম লাগব।'

'চৌকি খালি আছে।'

'কোন পাশের চৌকি খালি আছে?'

'পুব পাশের।'

বাড়িওয়ালা খুব আরাম করে পান চিবুতে চিবুতে বললেন, 'আগে আমার বাড়ি সম্পর্কে আপনাদের কিছু কথা কই, তাইলে ব্যাপারটা আপনাদের কাছে

কিলিয়ার হইব। আমার এ বাড়িতে রুম আছে ছয়টা। যেহেতু এইখানে সবাই ব্যাচেলর থাকে, তাই রুমগুলাতে পুরা দেয়াল দেয়া না। ছোট ছোট দেয়াল দিয়া ভাগ কইরা দিছি। আর একটা বড় রুম আছে, সেখানে চৌকি পাতা আছে সাতটা। প্রতি চৌকিতে শুইতে পারবে মাত্র একজন।'

'কিন্তু আমরা তো দুইজন।'

'তা তো দেখতেই পাইতেছি। একটা চৌকিতে দুইজন অবশ্য শোয়া যায়, তবে একটা রিস্কও আছে। দুজনের একজন যদি ঘুমানোর সময় একটু ফালাফালি করে কিংবা কোনো কমবখত স্বপ্ন দেইখা লাফাইয়া ওঠে, তাইলে আরেকজনের পইড়া যাওয়ার আশঙ্কা আছে।'

'না না, আমরা দুজনই যে কাতে ঘুমাই, সেই কাত থেকেই ঘুম থেকে উঠি।' টিংকু একবার আমার দিকে তাকায় সাপোর্ট পাওয়ার উদ্দেশ্যে। মাথা কাত করে আমি ওর কথার সত্যতা স্বীকার করি।

'তাইলে তো ভালোই।' বাড়িওয়ালা পাঞ্জাবির পকেট থেকে আরেকটা পান বের করে মুখে পুরে বলেন, 'এইবার তাইলে ভাড়ার কথায় আসি। আমার বাড়ি পুব আর দক্ষিণ দিকে খোলা। তাই পুব আর দক্ষিণ দিকের চৌকিগুলার ভাড়া একটু বেশি। পশ্চিম আর উত্তর দিকের চৌকিগুলার ভাড়া কম। অবশ্য আমি আরো একটা ব্যবস্থা রাখছি।'

'কী ব্যবস্থা সেটা?'

'ছোট দুইটা খালি জায়গা আছে আমার। সারা দিন ওখান দিয়া সবাই বাথরুমে যায়। রাত হইলে দুইটা চট আর মাদুর বিছায়া দেই। বিশেষ প্রয়োজন হলে ওইখানেও কেউ কেউ থাকে। তবে একটু সাবধানে থাকতে হয়। রাতেও মাঝে মাঝে অনেকের বাথরুমে যাইতে হয় তো।'

'না না, আমরা ওখানে থাকতে চাইছি না।'

'তাইলে এইবার ভাড়ার কথা বলি।' খুব আয়েশ করে পান চিবিয়ে মুখে জমে ওঠা রসগুলো শুসে নিয়ে বাড়িওয়ালা বলেন, 'পুব পাশের আর দক্ষিণ পাশের প্রতিটা চৌকির ভাড়া মাসে বারো শ টাকা।'

'উত্তর আর পশ্চিম পাশের?'

'ওদিকে তো খালি নাই।'

'একটু শুনতে চাইছি আর-কি।'

'ওই দুই পাশের প্রতিটা চৌকির ভাড়া নয় শ পঞ্চাশ টাকা।'

কিছুটা কৌতূহল নিয়ে আমি বলি, 'আর ওই বাকি জায়গাটা, মানে চট

আর মাদুরের ভাড়া?'

'চার শ টাকা।' বাড়িওয়ালা আবার পানের রস শুষে নিয়ে বলেন, 'তা এইবার আপনাদের মতামত বলেন।'

'থাকা যেহেতু লাগবে, সেহেতু ভাড়া তো নিতেই হবে। তবে— ।'

'তবে কী? আরে, মুখের ভেতর কথা রাখলে তো চলব না। যা বলার খোলাখুলি বলা ভালো।'

'মানে বলছিলাম আর-কি, একটু কম করা যায় না ভাড়াটা?'

'না, আমি যা বলি একবারই বলি। হাতে রাইখা কোনো কথা বলি না। যাক, আপনাদের জন্য একটা কাজ করতে পারি আমি।'

টিংকু বেশ আগ্রহী হয়ে বলে, 'কী?'

'বারো শ টাকা হইল এক চৌকিতে একজন থাকার জন্য। দুইজন থাকলে ভাড়া একটু বেশি লাগে। কিন্তু সেই বেশি ভাড়াটা আমি আপনাদের কাছ থেইকা নিমু না। কিন্তু সেইটা তিন মাসের জন্য।'

টিংকু একটু আমতা আমতা করে বলে, 'আচ্ছা ঠিক আছে।'

'তোমরা থাকবা এখানে কিন্তু খাইবা কোথায়?' বাড়িওয়ালা আপনি থেকে তুমিতে নামিয়ে এনেছেন আমাদের।

'সেটা তো ঠিক করিনি। আপনার কাছেই প্রথমে এসেছি।'

'আমার এইখানে খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থাও আছে। মফিজ হইল আমার ম্যানেজার। আমার এই বাড়ি দেখাশোনা থেইকা শুরু কইরা সব করে ও। আমি একটা বাবুর্চি রাইখা দিছি এখানে, জলিল নাম। ও সবাইরে রান্না কইরা খাওয়ায়। এর জন্য প্রত্যেককে এক শ টাকা কইরা দিতে হয় জলিলকে।'

'বাজারঘাট কি ওই জলিল সাহেবই করে?'

'জলিলকে সাহেব বলতে হইব না। বয়স কম ছেলেটার, কিন্তু লম্বা-চওড়া। তবে একটু মেয়েলি টাইপের।'

'হিজড়া নাকি?' কিছুটা ইতস্তত করে মাথাটা নিচু করে জিজ্ঞেস করি আমি বাড়িওয়ালাকে।

'না না, হিজড়া-টিজড়া না। রান্নাবান্না তো মেয়েলোকের কাজ। আর ও অনেক দিন এই রান্নাবান্না করে তো, তাই কেমন যেন একটু মেয়েমানুষের মতো হইয়া গেছে। কী যেন বলতেছিলে, হ্যাঁ বাজার করে কে। বাজার করে মফিজ। ওর মতো সস্তায় বাজার করতে এ অঞ্চলের কেউ পারে না। এইখানে সবাই ওরে সপ্তাহ কিংবা মাসিক ভিত্তিতে টাকা দেয়, ও মাস শেষে তার হিসাব

দেয় সবাইরে। কোনো সাত-সতেরো নাই এইখানে।'

'তাহলে তো খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা হলোই।'

'এইবার কিছু শর্ত আছে আমার।'

'বলুন।'

'আমার প্রথম শর্ত হইল—এইখানে কোনো মেয়েমানুষ আনা যাইব না। এইটা ব্যাচেলরদের মেস। শোনো বাবারা, তোমাদের মতো বয়স আমারও ছিল, আমরাও তো অনেক কিছু ঝুঝি। নাকি বুঝি না?'

'অবশ্যই বোঝেন। বুঝে বুঝেই এত বড় হয়েছেন।'

'মেয়েমানুষ না আনতে বলার আরেকটা কারণ আছে। প্রথম দিকে আমি কিন্তু আনতে না করি নাই। যুবকবয়সী ছেলেরা, ওদের তো দুই-একটা বান্ধবী-টান্ধবী থাকতেই পারে। এই সুযোগটাই নেয় একটা বজ্জাত ছেলে, তা প্রায় তিন বছর আগের ঘটনা। ছেলেটা প্রথম থেইকাই আমার পছন্দের ছিল না।'

টিংকু শরম পাওয়া হাসিতে বাড়িওয়ালাকে বলে, 'আমাদের আপনার পছন্দ হয়েছে তো?'

'অবশ্যই। না হইলে তোমাদের সঙ্গে এতক্ষণ কথা বলি নাকি! ঘটনার বাকিটা শোনো। একদিন সকালে দেখি আমার বাড়ির সামনে অনেকগুলা পুলিশ। আমি তখন আমার বাড়ির পাশের ওই বিল্ডিংয়ে ভাড়া থাকি।'

'এখন কোথায় থাকেন?'

'আমার এই বাড়ির পেছনে একটা একতলা বিল্ডিং আছে, এখন ওইখানে থাকি। তা যা বলতেছিলাম, পুলিশ দেইখা আমার তো আত্মা খাঁচা ছাড়া। ব্যাপার কী! ব্যাপারটা মারাত্মক। রাতে কোথা থেইকা একটা মেয়েরে আইনা এই বাড়িতে তুলছিল ছেলেটা। মেয়েটার বাবা পুলিশকে এইটা জানাতেই পুলিশ আইসা হাজির। তারপর যা হইল না, ছেলেটাকে পুলিশ ধইরা নিয়া যায়। আমিও ওর জিনিসপত্র সব ছুইড়া ফেইলা দেই রাস্তায়।' বাড়িওয়ালা মুখটা শক্ত করে বলেন, 'আমার দ্বিতীয় শর্ত হইল—এই বাড়িতে কেউ বিড়ি-সিগারেট খেতে পারব না। যুবকবয়সী মানুষ সব, বিড়ি-সিগারেট খাইব না! ওরাই তো ও-সব খাইব। আগে খাইতে দিতাম। কিন্তু একদিন রাত তিনটা—।' পাশে দাঁড়ানো মফিজের দিকে তাকিয়ে বাড়িওয়ালা বলেন, 'রাত তিনটাই তো ছিল মফিজ, না?'

মফিজ হাত কচলাতে কচলাতে বলে, 'জি সাব।'

'তিনটার সময় দেখি, আমার ঘর দিয়া ধোঁয়া বের হইতেছে আর কিসের যেন পোড়া পোড়া গন্ধ লাগতেছে। দ্রুত আইসা দেখি, একটা ছেলের বিছানায় আগুন লাইগা গেছে।'

'আগুন লাগল কোথা থেকে?'

'বিড়ি-সিগারেট হাতে নিয়া বিছানায় শুইয়া ছিল। হঠাৎ ঘুম আইসা যায়, সিগারেটটা বিছানায় পইড়া আগুন লাইগা যায়। তাও ভালো, আমার ঘরের কোথাও লাগে নাই।'

'দুই শর্ত শেষ। এবার তিন নম্বরটা বলুন?' আমি উৎসাহী হয়ে বাড়িওয়ালাকে বলি।

'তিন নম্বর শর্ত হইল— ।' পিচ করে পাশের দেয়ালে পানের পিক ফেলে বাড়িওয়ালা বলেন, 'ঘরবাড়ি নোংরা করা যাইব না।'

'কিন্তু দেয়াল নোংরা যাবে?' আমি বলি।

'না, দেয়ালও নোংরা করা যাইব না।'

'কিন্তু আপনি নিজেই যে দেয়ালে পানের পিক ফেলে নোংরা— ।' আমি কথাটা শেষ করার আগেই টিংকু আমার মুখটা চেপে ধরে বাড়িওয়ালার দিকে তাকিয়ে বলে, 'জি, আপনি এবার চার নম্বর শর্তটা বলুন।'

'আমার চার নম্বর শর্ত—ভাড়া দিতে হইব মাসের ৫ তারিখের মধ্যে। আমার মায়া-মমতা বেশি, তাই অনেকের দাবির মুখে আমি আরো দুই দিন বাড়ায়া ৭ তারিখ করছি। এর পরে হইলেই দিনপ্রতি বিশ টাকা বেশি দিতে হইব।'

'মানে এক দিন দেরি হলে বিশ টাকা, দুই দিন দেরি হলে চল্লিশ টাকা, এ রকম তো?'

'হ্যাঁ। তেমন আর কোনো শর্ত নেই আমার। ছোটখাটো দুই-একটা কথা আছে—পানি বিদ্যুৎ কম খরচ করতে হইব, বেশি রাত কইরা বাইরে কাটানো যাইব না, এই আর-কি।' বাড়িওয়ালা পকেট থেকে আরেকটা পান মুখে দিয়ে বলেন, 'আসল কথাটা বলতে ভুইলা গেছি।'

'জি বলুন।'

'বাসায় ওঠার আগে এক মাসের ভাড়া অগ্রিম দিতে হইব কিন্তু।'

ঝট করে আমি টিংকুর দিকে তাকাই। টিংকু তাকিয়ে আছে বাড়িওয়ালার দিকে। কী নির্ভার ওর চাহনি! ওকে দেখে মনে হচ্ছে ব্যাংকে ওর কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা আছে, আর এ মুহূর্তে পকেটে তো দু-চার লাখ আছেই। কিন্তু আমি তো

জানি, সাকল্যে আমাদের কত টাকা আছে!

'একটা কথা ছিল আমার।' টিংকু খুব বিনয়ী হয়ে বাড়িওয়ালাকে বলে। খোদার কসম, আমার এ জীবনের এত বিনয়ী হয়ে কাউকে কথা বলতে দেখিনি, টিংকুকে তো নয়ই।

বাড়িওয়ালা অন্য দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বলো।'

'এতক্ষণ ধরে আমরা কথা বলছি। আপনাকে আমাদের এত ভালো লেগেছে। আপনি আমাদের ভাতিজা বলে ডাকতে পারেন। আমি হচ্ছি টিংকু ভাতিজা, আর ও হচ্ছে সুমিত ভাতিজা। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে, আমরা আপনাকে চাচা বলে ডাকতে পারব না।'

বাড়িওয়ালা অন্য দিকে তাকিয়ে বলেন, 'তাইলে কী বইলা ডাকবা?'

'কী বলে ডাকব?' টিংকু আগের মতো বিনয়ী হয়ে বলে, 'আপনাকে আমরা স্যার বলে ডাকব।'

'কী!' বলেই বাড়িওয়ালা বিষম খান শব্দ করে। আমি নিশ্চিত, গলায় পান আটকে গেছে তার। আমি এও বিশ্বাস করি, আজ রাতে তার কোনোমতেই ঘুম হবে না। জীবনে অনেক সম্বোধন শুনেছেন তিনি, কিন্তু কেউ তাকে স্যার বলে ডাকবে, তাও আবার আমাদের মতো আধুনিক কোনো যুবক, এটা তিনি কল্পনা তো দূরের কথা, স্বপ্নেও ভাবেননি। বাড়িওয়ালার দিকে ভালো করে তাকালাম আমি। পায়ে প্লাস্টিকের পাম্প শু, লুঙ্গি পরা, থুতনিতে ছাগুলে দাড়ি আর সস্তা কাপড়ের পাঞ্জাবি পরা লোকটা! তাকে স্যার বলবে টিংকু, বলতে হবে আমাকেও! হায়! এই স্যার ডাকার দামটা না-জানি কী দিয়ে পরিশোধ করে টিংকু। ওকে তো আমি জানি, চিনি।

'স্যার, আপনার কাছে একটা অনুরোধ ছিল আমার।'

স্যার শুনেই কিছুটা ভাব নিয়ে বাড়িওয়ালা বললেন, 'বলো।'

'আপনাকে এখনই আমরা অগ্রিম দিতে পারব না। আপনি আমাদের রাত আটটা পর্যন্ত সময় দিন। এর মধ্যে আমরা অগ্রিম নিয়ে আপনার কাছে পৌঁছে যাব। স্যার—।' টিংকু বিনয়ে গলে পড়ে বলে, 'আপনি নিজেই বলেছেন, আপনার মায়া-মমতা বেশি। আপনি আজকের মতো আমাদের একটু মায়া-মমতা করুন।'

কিছুক্ষণ ভেবে বাড়িওয়ালা বললেন, 'যাক, তোমরা যখন আমাকে ষাঁড় বইলা ডাকছ—।'

'ষাঁড় না, স্যার।' আমি সংশোধন করে দিই।

'ওই হইল। তোমরা যেহেতু আমাকে ষাঁড় বইলা ডাকছ, আমি খুব সম্মানীয় অনুভব করতেছি।'

'সম্মানীয় না, সম্মান।'

'এই ছেলে, তুমি এত কথা বলো কেন! আমি যা বলি সেইটাই ঠিক।'

'জি জি, ঠিক।' টিংকু মফিজের মতো হাত কচলায় একবার।

বাড়িওয়ালা আমার দিকে একটু রাগী চোখে তাকিয়ে আবার টিংকুর দিকে ফিরে তাকিয়ে বলে, 'রাত আটটা না, দশটা পর্যন্ত সময় দেওয়া হইল তোমাদের। আশা করি এরই মধ্যে আইসা পড়বা তোমরা। তার বেশি দেরি হইলে আমার কিন্তু তখন আর কিছু করার থাকব না।'

'না না, আমরা আটটার মধ্যেই এসে পড়ব।'

বাড়িওয়ালার সামনে থেকে চলে এলাম আমরা। একটু ফাঁকে এসে টিংকুর দিকে তাকিয়ে বললাম, 'এই অল্প সময়ের মধ্যে এত টাকা পাবি কোথায় তুই? আমার তো হাত-পা কাঁপছে।'

পকেট থেকে হোটেল ম্যানেজারের দেওয়া পঞ্চাশ টাকার নোটটা বের করল টিংকু, কিন্তু কিছু বলল না। কী যেন ভাবছে ও গভীরভাবে।

প্যাকেটটা রাখা হয়েছে ফুটপাতের একপাশে। তার নিচে দুটো ইট রাখা, যাতে প্যাকেটটা সবাই ভালো করে দেখতে পারে।

দশ ইঞ্চি বাই দশ ইঞ্চির একটা প্যাকেট, কাগজের প্যাকেট। লাল রঙের একটা র‍্যাপিং পেপার দিয়ে মোড়ানো হয়েছে সেটা। গোল হয়ে চারপাশে দাঁড়ানো সবাই উৎসুক হয়ে তাকিয়ে আছে প্যাকেটটার দিকে।

টিংকু সবার মাঝখানে এসে দাঁড়াল। খুক্ করে একটু কেশে সবার দিকে এক পলক তাকিয়ে বলল, 'সম্মানিত ভাই, বোন ও মায়েরা—।' ভালো করে দেখার জন্য চারপাশটায় আবার তাকাল টিংকু। কোনো মেয়ে নেই এখানে। নিজেকে সংশোধন করে ও বলল, 'দুঃখিত, এখানে কোনো মা-বোন নেই। সুতরাং মা-বোন বাদ। সম্মানিত ভাইয়েরা, সবার সময়ের মূল্য অনেক বেশি। আপনারা সেই মূল্যবান সময় নষ্ট করে এখানে দাঁড়িয়েছেন, আপনারা একটু সময় দিয়েছেন আমাকে, সে জন্য আপনাদের কোটি কোটি ধন্যবাদ। তবে সবাই যেন কেমন গোমরা মুখে দাঁড়িয়ে আছেন এখানে। সবার মনে কেমন যেন দুঃখ দুঃখ ভাব। আপনাদের এই দুঃখ দুঃখ ভাব ভালো লাগছে না

আমার। প্রথমেই তাই একটা হাসির ঘটনা শোনাই আপনাদের। হাসির ঘটনাটা শুনতে শুনতে আপনারা হাসতে হাসতে মাটিতে গড়াগড়ি খাবেন। কী, আপনারা হাসির ঘটনা শুনতে রাজি?'

চারপাশের সবাই না, বেশ কয়েকজন একসঙ্গে বলে উঠল, 'রাজি।'

'ঘটনাটা বিদেশি। তাই একটু ভালো করে শুনবেন। যে যত ভালো করে শুনবেন, সে তত বেশি মজা পাবেন।'

লোকজন আস্তে আস্তে বাড়ছে। টিংকুর চেহারাও আস্তে আস্তে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। দু হাত দিয়ে জোরে একটা তালি দিয়ে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে টিংকু বলল, 'আমি আগেই বলে নিয়েছি, ঘটনাটা বিদেশি। আপনারা যে যত মনোযোগ দিয়ে শুনবেন, সে তত বেশি মজা পাবেন।'

'আমরা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছি, আপনি বলেন।' পাশ থেকে একজন খুব আগ্রহ নিয়ে বলল।

মুচকি হাসল টিংকু। ধীরে ধীরে আগ্রহী করতে পারছে ও সবাইকে। আমি খেয়াল করে দেখি, ওর চেহারা ও ভাবভঙ্গিও হয়ে উঠছে ছোটবেলা স্কুলে যাওয়ার সময় দেখা সর্বরোগের ওষুধ বিক্রি করা ঝানু ক্যানভাসারের মতো—বাকপটু, কুশলী, চতুর, পাকা অভিনেতা।

'হ্যাঁ, আমি শুরু করছি। তার আগে আপনারা এই প্যাকেটটার দিকে তাকান।' টিংকু লাল র‍্যাপিং পেপার দিয়ে মোড়ানো প্যাকেটটা হাত দিয়ে ইশারা করে দেখাল। বেশ ভিড় জমে গেছে। সবাই প্যাকেটটার দিকে তাকাল, কেউ কেউ ভিড় ঠেলে পেছন থেকে দেখার চেষ্টা করল। তা দেখে প্যাকেটটা হাতে নিল টিংকু, 'আপনাদের দেখার সুবিধার জন্য প্যাকেটটা উঁচু করে ধরলাম আমি। আপনারা ভালো করে এই প্যাকেটটা দেখুন। এখানে একটা দামি জিনিস আছে। এই জিনিসটা আপনাদের জন্য। তবে সবাইকে এটা দিতে পারব না। মাত্র একজন পাবেন এটা। কে সেই ভাগ্যবান? তার আগে ঘটনাটা শেষ করি। আবারও বলছি মনোযোগ দিয়ে শুনুন, মজা পাবেন।'

সবাই কেমন যেন একটু সোজা হয়ে দাঁড়াল। উৎসুক হয়ে তাকিয়ে রইল প্যাকেটটার দিকে। আমার মনে হলো, সবাই নিজেকে ভাগ্যবান ভাবা শুরু করেছে। টিংকু চারপাশটা ঘুরে একটু মুচকি হাসল। যা আশা করা হয়েছিল, লোকজন তার চেয়ে বেশি জড়ো হয়েছে। আবার একটু কেশে টিংকু শুরু করল, 'রাত আটটার দিকে একটি বারে বসে মদ খাচ্ছিল রিগ্যান।' টিংকু

সবার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনারা বার চেনেন তো?'

পেছন থেকে একজন বলল, 'হ্যাঁ, যেখানে মদ বিক্রি করা হয়।'

'কোন ভাই বললেন?' টিংকু পেছনের দিকে তাকায়, 'ভাই, আপনি সামনে আসুন।' লোকটার একটা হাত ধরে সামনের একটা জায়গায় দাঁড় করিয়ে টিংকু বলল, 'আপনি এখানে দাঁড়ান।' লোকটার কাছ থেকে সরে এসে আবার মাঝখানে দাঁড়িয়ে টিংকু বলল, 'হ্যাঁ, রিগ্যান মদ খেতে খেতে এত বেশি খেয়ে ফেলল যে চোখে ঝাপসা দেখতে লাগল সে। হঠাৎ সে দেখতে পেল, একটা সুন্দরী মেয়ে এসে দাঁড়িয়েছে তার সামনে। রিগ্যান মুচকি হেসে মেয়েটাকে বলল, হাই। মেয়েটাও সঙ্গে সঙ্গে বলল, হাই।

রিগ্যান ঢুলতে ঢুলতে একটু সোজা হয়ে বসল। তারপর মেয়েটার দিকে ভালো করে তাকিয়ে বলল, আমার নাম রিগ্যান, আপনার?

আমি অর্থি।

বেশ কিছুক্ষণ রিগ্যানের দিকে তাকিয়ে থাকার পর অর্থি বলল, তুমি কি আজ রাতে আমার বাসায় ডিনার করবে?

প্রস্তাবটা পেয়েই রিগ্যানের নেশা কিছুটা কেটে গেল। এ যে মেঘ না চাইতেই শুধু পানি না, একেবারে রেশমি, নার্গিস, সুনামি—সব! রিগ্যান অর্থির দিকে একটু ঝুঁকে বসে বলল, কেন নয়?

এক্ষুনি যাবে?

আমার আপত্তি নেই।

রিগ্যানকে গাড়িতে উঠিয়ে অর্থি সোজা তার বেডরুমে নিয়ে এলো। অসম্ভব সুন্দর করে সাজানো অর্থির বেডরুম। ঝকঝক করছে সবকিছু। রুমটার সমস্ত কিছু দেখতে দেখতে দেয়ালে ঝোলানো একটা ছবির দিকে চোখ আটকে যায় রিগ্যানের। নেশার তোড়ে তখনো একটু একটু ঝাপসা দেখছিল সে। দেয়ালের দিকে এগিয়ে গিয়ে তাই সে ভালো করে দেখতে থাকে ছবিটা। চোখ দুটো হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে ডলে সে অর্থিকে বলে, ছবির এই লোকটার সঙ্গে তোমার চেহারার অনেক মিল দেখছি। তোমার ভাই বুঝি?

আরে না। রহস্যময় একটা হাসি দেয় অর্থি।

অর্থির হাসি দেখে রিগ্যান কিছুটা দ্বিধা নিয়ে বলে, তাহলে কে, তোমার স্বামী?

মুখের হাসিটা আরো প্রসারিত করে অর্থি বলল, না না, আমি তো এখনো বিয়েই করিনি।

মন খারাপ হয়ে যায় রিগ্যানের। সে সেই মনখারাপ নিয়েই বলে, তাহলে ছেলেটা নিশ্চয় তোমার প্রেমিক?

না রিগ্যান। তুমি আবার ভুল করছ।' টিংকু এটুকু বলেই সবার দিকে আবার একপলক তাকাল, 'আপনারা কেউ বলতে পারবেন, ছবির এই ছেলেটা আসলে কে?'

পাশ থেকে একজন বললেন, 'অর্থির বাবা।'

'না, হলো না।'

'তাহলে অর্থির মৃত কোনো বন্ধু?' আরেকজন বললেন।

'না, অর্থির বন্ধুও না।'

'তাহলে?' পেছন থেকে একজন শব্দ করে বললেন। বেশ আগ্রহী হয়ে উঠেছেন তিনি।

'বলব। তার আগে এই প্যাকেটটার দিকে আবার একটু তাকান আপনারা। আপনাদের আগেই বলেছি, দামি একটা জিনিস আছে এখানে। এ জিনিসটা নিয়ে একটা লটারি করব আমি। প্রতিটা লটারির দাম মাত্র দশ টাকা, দশ টাকা। আপনারা অনেকেই টিকেট কেনেন, কিন্তু তার ফল বের হয় কয়েক মাস পর। আমার এই লটারির ফল আমি একটু পরই প্রকাশ করব। আর যিনি বিজয়ী হবেন, তাকে এখনই এই প্যাকেটের পুরস্কারটা দেওয়া হবে। আছেন কোনো ভাই?'

সামনের দিকে একটু এগিয়ে গেলাম আমি। তারপর পকেট থেকে টিংকুর দেওয়া দশ টাকার একমাত্র নোটটা বের করে বললাম, 'ভাই, আমাকে একটা টিকেট দিন।'

সাদা কাগজ কেটে বানানো একটা টিকেটের দু অংশের একটা অংশ টিংকু ছিঁড়ে রাখল। আরেক অংশ আমার হাতে দিয়ে আমাকে বলল, 'থ্যাংক ইউ, ভাই। আপনিই প্রথম টিকেট কিনলেন, অশেষ ধন্যবাদ আপনাকে।' তারপর অন্য দিকে তাকিয়ে ও বলল, 'আর কোনো ভাই নেবেন?'

পেছন থেকে একজন ভিড় ঠেলে ইতস্তত ভঙ্গিতে বলল, 'আমাকেও একটা দিন।'

টিংকুকে আর কিছু বলতে হলো না। সামনে, পেছনে, ডান পাশ, বাঁ পাশ থেকে বেশ কয়েকজন টিকেট কিনল। তাদের দেখাদেখি আরো কয়েকজন কিনল। বেশির ভাগ লোক যখন টিকেট কেনা শেষ করল, তখন টিংকু আমাকে ডেকে বলল, 'আপনি তো প্রথম টিকেট কিনেছেন, দেখুন তো মোট

কতগুলো টিকেট বিক্রি হলো?'

সবগুলো টিকেটের ছেঁড়া অংশ আমার হাতে দিল টিংকু। আমি গুনতে লাগলাম সেগুলো। মোট উননব্বইটা টিকেট বিক্রি হয়েছে। টিংকুকে সেটা বলতেই সে কিছুটা শব্দ করে বলল, 'সবাইকে ধন্যবাদ। আর মাত্র এগারোটা টিকেট বিক্রি হলেই লটারি করা শুরু করব আমি। আছেন আর কোনো ভাই?'

পেছন থেকে দুজন লোক টিকেট কিনল। হুজুগে বাঙালি। তাদের দেখাদেখি আরো তিনজন টিকেট কিনল। সবগুলো টিকেট নাড়তে নাড়তে টিংকু বলল, 'মোট চুরানব্বইটা টিকেট বিক্রি হয়েছে। আর মাত্র ছয়টা। আছেন কোনো ভাই?'

বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল টিংকু। আর কেউ টিকেট কিনল না। সবার দিকে আরেকবার ফিরে তাকাল ও। না, সবাই গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে আছে। আর কেউ কেনার নেই।

'আমার মনে হচ্ছে আর কেউ টিকেট কিনবে না।' টিংকু টিকেটের অংশগুলো ভাঁজ করতে লাগল। খুব দ্রুত সে সবগুলো ভাঁজ করে বলল, 'হ্যাঁ, আমি এখন লটারি করব। তার আগে ওই ঘটনাটা শেষ করব। কোথায় যেন আমরা শেষ করেছিলাম?'

পাশ থেকে একজন বললেন, 'ছবির ছেলে অর্থির বাবাও না, মৃত বন্ধুও না। তাহলে কে?'

'হ্যাঁ, ছেলেটা তাহলে কে?' টিংকু মুচকি হেসে বলল, 'রিগ্যানও শেষে বেশ অধৈর্য হয়ে অর্থিকে বলেছিল, তাহলে ছেলেটা কে? অর্থি তখন তার হাসিটা আরো রহস্যময় করে বলেছিল, এটা আমি।

'এটা তুমি!' অবাক হয়ে যায় রিগ্যান।

'হ্যাঁ আমি। এটা আমার অপারেশনের আগের ছবি!'

ঘটনাটা শেষ করল টিংকু। কিন্তু কেউ হাসল না। সবাই চুপচাপ এবং গম্ভীর। হঠাৎ করে একটা বয়স্ক লোক হো হো করে হেসে উঠলেন। তার হাসির সঙ্গে সঙ্গে হেসে উঠল আরো কয়েকজন। কিন্তু আমার মনে হলো, তারা বুঝে হাসেনি। হাসি একটা সংক্রামক ব্যাপার, লোকটার হাসি দেখে তারা সবাই হেসেছে।

'যাক, আমি এবার লটারি করব।' টিংকু সবগুলো টিকেটের অংশ ফুটপাতে ছুড়ে ফেলে সামনের দিকে তাকাল। তারপর একটা বৃদ্ধ লোককে বলল, 'মুরব্বি, আপনি এসে একটা কাগজ তোলেন তো।'

বেশ উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে এগিয়ে এলেন বৃদ্ধটি। টিকেটগুলোর দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে শেষে একটি টিকেট তুলে টিংকুর হাতে দিলেন। টিংকু আস্তে আস্তে টিকেটটা খুলে বলল, 'তিন আর এক—একত্রিশ। একত্রিশ নম্বর টিকেটটা কার?'

পাশ থেকে অল্পবয়সী একটা ছেলে কিছুটা লাফিয়ে উঠে বলল, 'আমার, আমার টিকেটের নম্বর একত্রিশ।'

'দেখি দেখি!' টিকেটটা হাতে নিয়ে সেটা দেখে টিংকু বলল, 'হ্যাঁ, আপনিই বিজয়ী।'

ফুটপাত থেকে প্যাকেটটা হাতে নিল টিংকু। তারপর সবার উদ্দেশে বিজয়ী ছেলেটাকে দেখিয়ে বলল, 'উনি বিজয়ী হয়েছেন। ওনাকে এমনি এমনি পুরস্কারটা দিই কীভাবে। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, ওনার সঙ্গে এক কাপ চা খাব। তারপর পুরস্কারটা ওনার হাতে তুলে দেব।'

একে একে সবাই চলে যেতে লাগল। আমিও সরে এলাম ওখান থেকে। বেশ কিছুক্ষণ পর সবাই চলে গেলে আমি আবার আগের জায়গায় ফিরে আসি। পুরস্কার বিজয়ী ছেলেটা বেশ উচ্ছল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। টিংকু আমাকে দেখেই ছেলেটাকে বলল, 'চা খাওয়ার দরকার আছে কি?'

পুরস্কার পাওয়ার আনন্দে ছেলেটা বলল, 'না না, দরকার নাই।'

টিংকু সঙ্গে সঙ্গে প্যাকেটটা ছেলেটার হাতে দিল। ছেলেটাও প্যাকেটটা হাতে নিয়ে খুলে ফেলল সেটা। তারপর চোখ বড় বড় করে টিংকুকে বলল, 'কই, এর ভেতর তো কিছু নাই! এটা তো খালি!'

'খালি?' টিংকু পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বের করে ছেলেটার হাতে দিয়ে বলল, 'এটা যেহেতু খালি, সেহেতু আপনার টাকাটা ফেরত নিন। আপনাকে যেহেতু কোনো জিনিস দিতে পারলাম না, তাই আপনার টাকাটাও রাখলাম না। কী, এবার খুশি?'

বাড়িওয়ালা চাচা আমাদের দেখেই মুচকি একটা হাসি দিলেন। সেই আগের জায়গাতেই বসে আছেন এবং যথারীতি পান চিবুচ্ছেন। তার ঘাড় টিপছে একজন। কেমন যেন মেয়েদের মতো তার অভিব্যক্তি। আমরা কাছে যেতেই তিনি বললেন, 'জলিল, যা, এখন আর ঘাড় টিপতে হইব না।'

জলিল আমাদের দিকে তাকিয়ে কী রকম একটা চাহনি দিয়ে চলে গেল।

পকেট থেকে টাকা বের করে বাড়িওয়ালার হাতে দিল টিংকু। টাকাটা হাতে নিয়েই তিনি আঙুলে থুতু লাগিয়ে গুনতে লাগলেন টাকাগুলো। গোনা শেষে ভাবলেশহীনভাবে তিনি বললেন, 'এইটা কী দিলা তোমরা! তোমাদের দেয়ার কথা এক মাসের অগ্রিম ভাড়া, অর্থাৎ বারো শ টাকা, আর তোমরা দিতেছ আট শ টাকা।'

'স্যার— ।' টিংকু চেহারা যথাসম্ভব নিষ্পাপ করে বলে, 'আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি স্যার। আপনি শুধু আজকের রাতটা থাকতে দিন, কালকেই আমরা বাকি টাকাটা দিয়ে দেব।'

'তোমাদের তো আমার বিশ্বাস হইতেছে না।'

'বিশ্বাস না হওয়ারই কথা স্যার। আমরা দিতে চেয়েছি বারো শ টাকা, সেখানে দিচ্ছি আট শ টাকা। আমাদের বিশ্বাস করবেন কী করে। আপনি খুবই সত্য কথা বলেছেন স্যার।' মুহূর্তের মধ্যেই চেহারাটা কাঁদো কাঁদো করে ফেলে টিংকু। তারপর একটু চুপ করে থেকে বলে, 'কিন্তু স্যার, রাতও হয়ে গেছে। আপনি মুরব্বি মানুষ, মায়া-মমতার শরীর আপনার, এই রাত-বিরাতে কোথায় থাকব, যদি একটু বলে দিতেন।'

'তোমরা কোথায় থাকবা, সেইটা আমি কীভাবে কমু!'

'সেটাও তো ঠিক, আপনি কীভাবে বলবেন।'

'তোমরা পোলাপান মানুষ, তোমাদের বুদ্ধিসুদ্ধি কম।'

'জি, আপনি একেবারে সত্য কথা বলেছেন স্যার।'

'তোমাদের কাণ্ডজ্ঞানও কম।'

'জি, সেটাও কম।'

'আমারও কাণ্ডজ্ঞান কম।'

'জি জি, আপনারও কাণ্ডজ্ঞান কম।' টিংকু দ্রুত জিভে কামড় দিয়ে বলে, 'ছি ছি, আপনার কাণ্ডজ্ঞান কম হবে কেন। আপনি কত জ্ঞানী তা তো আপনার সঙ্গে কথা বলেই টের পাচ্ছি আমরা। একটা কথা বলব স্যার?'

মুখের ভেতর জমে ওঠা পানের রসগুলো চুষে নিয়ে বাড়িওয়ালা বলেন, 'বলো।'

'আমাদের তো আজ রাতে বাইরেই থাকতে হবে। রাতে কি-না-কি হয়, আপনি যদি এই আট শ টাকা রেখে দিতেন। কাল এসে বাকি টাকা দিয়ে আপনার বাসায় উঠতাম আমরা। প্লিজ, স্যার, 'না' করবেন না। আপনি হচ্ছেন মুরব্বি। অনেকের ছায়া, বটবৃক্ষ, পাখপাখালির আশ্রয়।' টাকাটা

বাড়িওয়ালার হাতে দিয়ে টিংকু বলে, 'স্যার, যদি একটু দাঁড়াতেন।'

'কেন?'

'আপনার পায়ে হাত দিয়ে একটু সালাম করতাম স্যার। আপনার মতো মানুষের, না না মহামানুষের পায়ে হাত দিয়ে সালাম করাও পুণ্যের কাজ।'

'না, সালাম-টালাম করতে হইব না।' বাড়িওয়ালা একটু নরম স্বরে বলেন, 'এত রাতে কোথায় থাকবা তোমরা?'

'আল্লাহ যেদিকে নেয় সেদিকেই যাব স্যার।'

'কী যে মুশকিলে ফালাও না তোমরা! মফিজ, এই মফিজ—।' বাড়িওয়ালা চিৎকার করে ডাকতে থাকেন বাড়ির ম্যানেজারকে।

মফিজ দৌড়ে এসে বলে, 'জি সাব?'

'যা, ওদের জায়গাটা দেখায়া দে।'

'পুরো টাকা দিয়েছে সাব? পুরো টাকা না নিয়া কাউরে বাসায় তোলা ঠিক না। পরে আর টাকাটা দেয় না। যদিও দেয়, অনেক গাঁইগুঁই কইরা দেয়।' আমাদেরকে বাসায় তুলতে বেশ আপত্তি জানায় মফিজ।

'হ্যাঁ দিছে। যা, ওদের চৌকিটা দেখায়া দে।'

টিংকু ব্যাঙের মতো লাফ দিয়ে বাড়িওয়ালার পা ছুঁয়ে সালাম করতে করতে বলে, 'আপনি সত্যি মহান স্যার।' টিংকু আমার দিকে তাকিয়ে বেশ রাগী স্বরে বলে, 'এই গাধা, বসে আছিস কেন, স্যারকে সালাম কর।'

দু পায়ের সঙ্গে বড় দুটো পাথর বাঁধা রয়েছে যেন আমার। সামান্যতম ইচ্ছা হয় না এই বসা থেকে উঠতে। জীবনে কখনো কারো পা ছুঁয়ে সালাম করিনি, এমনকি বাবা-মাকেও না। আর জীবনের প্রথম সালামটাই আমাকে করতে হবে এ রকম একটা খাট্টাস টাইপের লোকের পা ছুঁয়ে! মন-প্রাণ-দেহ একসঙ্গে বিদ্রোহ করে ওঠে আমার। তবু আমাকে উঠতে হয়। লোকটার পায়ের কাছে গিয়ে হাত দিয়ে সালাম করতে হয় আমাকে!

মফিজ মিয়া আমাদের পাশের রুমে থাকে। বাড়ির ম্যানেজার হিসেবে তার একটা আলাদা রুম আছে। সেই রুমের বারান্দায় তার গামছা আর লুঙ্গি মেলে দেওয়া। মাঝরাতের দিকে টিংকু আমাকে হাত দিয়ে জাগিয়ে বলল, 'চল, বাইরে যাই।'

'কেন?'

'কাজ আছে।'

বাইরে এসে টিংকু মফিজের রুমের সামনে এলো। তারপর এদিক-ওদিক তাকিয়ে রুমের সামনে মেলে দেয়া গামছাটা হাতে নিল ও। ইশারায় আমাকে এখানে দাঁড়িয়ে থাকতে বলে তারপর চলে গেল বাথরুমে। একটু পর গামছাটা ভিজিয়ে এনে মেলে দিল আগের জায়গায়। আমি ফিসফিস করে বললাম, 'এটা কী করলি?'

'কী করলাম?' রহস্যময় একটা হাসি দিয়ে টিংকু বলল, 'কাল সকালে জানতে পারবি।' আমার হাত ধরে রুমে চলে এলো তারপর।

সকালে ঘুম ভাঙল মফিজের চিৎকারে। সারা মেসবাড়িটা চিৎকার করে সে মাথায় তুলেছে। এরই মধ্যে কাকে যেন কুৎসিত একটা গালিও দিল। আমি আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে বিছানা থেকে উঠে শব্দ করে বললাম, 'এই সাতসকালে কী হয়েছে মফিজ ভাই?'

মফিজ গোঙাতে গোঙাতে বলল, 'কী হইছে সেইটা পরে বলতেছি। আগে সবাই ওঠেন। বারান্দায় আসেন সবাই।'

সবাই বারান্দায় এলো, কেবল টিংকু ছাড়া। আমি ওকে বললাম, 'উঠবি না? মফিজ ডাকে।'

টিংকু একটু রেগে গিয়ে বলল, 'কেন ডাকে?'

'তা তো জানি না।'

'ও আগে এসে বলুক, তারপর উঠব।'

মফিজ বাইরে থেকে আবার চিৎকার করে ওঠে, 'আর কে কে আছে ঘরের ভেতর?'

বের হয়ে এলাম আমি। বারান্দায় সবাই সারি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখেই মফিজ বলল, 'আপনার সাথের জন কই?'

'ও এখনো ঘুমিয়ে আছে।'

'কেন, আমার কথা কানে যায় নাই?'

'সেটা তো বলতে পারব না।'

'আপনি ডাকেন তাকে। আমার মাথা গরম হয়া গেছে, হট হয়া গেছে, যেকোনো মুহূর্তে যেকোনো কিছু করে ফেলতে পারি আমি।' মফিজ রাগে গোঙাতে থাকে।

আমাকে যেতে হলো না, ঘর থেকে বের হয়ে এলো টিংকু। তারপর সোজা মফিজের সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলল, 'মফিজ সাহেব, আপনি কি মনে

করেন কেবল আপনার মাথাই গরম? আরো অনেকের মাথা আরো গরম থাকতে পারে, যেকোনো মুহূর্তে সেটা গরম হয়েও যেতে পারে। যেমন আমার ঘুমের সময় কোনো কুকুর ঘেউ ঘেউ করলে কিংবা কোনো মানুষ চেঁচামেচি করলে মাথা গরম হয়ে যায় আমার। আমি এখানে নতুন, তাই আজ একটু গরম কম হয়েছে। এর পরে এ রকম হলে দেখবেন, মাথা গরম হয়ে গেছে, কত গরম হয়ে গেছে!'

'আপনি এইটা কী বোঝাইতে চান আমাকে?'

'আমি কিছুই বোঝাতে চাইছি না আপনাকে। আমি কেবল বলতে চাইছি, এরপর গরম হলে একটা চায়ের কেতলি নিয়ে এসে আমার মাথার ওপর রেখেন, দেখবেন টগবগ করে ফুটে উঠেছে পানি।' টিংকু হাই তুলতে তুলতে বলে, 'বলুন, কী হয়েছে আপনার?'

'আমি কয়েক বছর হইল এইখানে আছি, কোনো দিন কোনো সমস্যা হয় নাই। আজ হঠাৎ সমস্যা হইল। আমার মাথায় কিছু আসতেছে না।'

'সমস্যাটা কী, বলুন?'

'সমস্যাটা গুরুতর।'

'গুরুতর সমস্যাটাই বলুন।'

'আমার ওই গামছাটা—।' মফিজ তার ঘরের বারান্দায় মেলে দেয়া গামছাটা দেখিয়ে বলে, 'রাতেও মেলা ছিল ওইখানে। আমি এইখানে আসার পর থিকা ওভাবেই মেলে দেই গামছা। কোনো দিন কোনো কিছু হয় নাই, আজ সকালে গামছাটা হাতে নিয়া দেখি, সারা গামছায় প্রস্রাবের গন্ধ!'

ঝট করে আড়চোখে আমি টিংকুর দিকে তাকাই, টিংকুও একপলক আমার দিকে তাকায়। তারপর মফিজের দিকে ফিরে তাকিয়ে বলে, 'প্রস্রাবের গন্ধ হয়েছে ধুয়ে ফেলুন।'

'ধুইয়া তো ফেলব, কিন্তু কাজটা করল কে?'

'কোন কাজটা?'

'আপনি বোধহয় কিছুই বোঝেন না!'

'হ্যাঁ, আমি কোনো কোনো জিনিস কম বুঝি। আবার কোনো কোনো জিনিস এত বেশি বুঝি, তখন মুশকিল হয়ে যায় অনেকের। বলুন, কোন কাজটার কথা বলছেন আপনি?'

'আমার বিশ্বাস কেউ একজন আমার এই গামছা ভইরা প্রস্রাব করছে। না হলে গামছাটা এইভাবে গন্ধ হওয়ার কথা না।'

'সেই কেউ একজন কে? আপনার কাকে সন্দেহ হয়?'

'একজন ছাড়া তো সবাইকেই আমার সন্দেহ হয়।'

'সেই একজন কে?'

মফিজ হাত দিয়ে ইশারা করে বলল, 'ওই জলিল।'

'জলিলকে আপনার সন্দেহ হয় না কেন?'

'ও আমার কাছের মানুষ।'

'মফিজ সাহেব।' টিংকু একটু হেসে বলে, 'কাছের মানুষরাই কিন্তু আগে শত্রু হয়। মীরজাফরও কিন্তু নবাব সিরাজউদ্দোলার কাছের মানুষ ছিল, খুব কাছের মানুষ।'

'জলিল ও রকম করব না।'

'তাহলে কে করেছে?'

'সেটাই আমি বের করতে চাচ্ছি।'

'কীভাবে বের করবেন?'

'সেইটাই বুঝতে পারছি না।'

'আমি একটা বুদ্ধি দিতে পারি আপনাকে।'

'কী বুদ্ধি?'

'সবার প্রস্রাবের গন্ধ কিন্তু এক না। আলাদা আলাদা গন্ধ। এখানে যতগুলো মানুষ আছে, সবাইকে আপনি একটা করে গ্লাস বা বাটি কিনে দিতে পারেন। তারা ওই বাটি বা গ্লাসে প্রস্রাব করে একে একে আপনাকে দেবে, আপনি তখন ওই প্রস্রাবের গন্ধ শুঁকে তারপর গামছার গন্ধ শুঁকবেন। যারটা মিলে যাবে, বুঝবেন সে-ই আপনার গামছায় আকামটা করেছে।' টিংকু খুব সিরিয়াস ভঙ্গিতে কথাটা বলে।

'এইটা কি সম্ভব!'

'আপনি শুঁকতে না পারেন, আপনার কাছের মানুষ জলিলকে দিয়ে শোঁকান!' টিংকু জলিলের দিকে তাকিয়ে বলে।

জলিল সঙ্গে সঙ্গে মুখ বাঁকা কলে বলে, 'হুহ্, আমার ঠ্যাকা পড়ছে। মুতব আরেকজন, শুঁকুম আমি। আমি গেলাম, আমার রান্নাবান্না আছে, সকালের নাশতা বানাইতে হইব।' অবিকল মেয়েদের মতো হাঁটতে হাঁটতে জলিল চলে যায়। তার আগে টিংকুর দিকে তাকিয়ে আগের মতো কী রকম একটা চাহনি দেয় সে।

টিংকু সবার দিকে তাকিয়ে বলে, 'আপনাদের মাথায় কোনো আইডিয়া

আছে?'

'আমার কাছে একটা কামেল মানুষের খোঁজ আছে।' মোটামতো বেঁটে করে একটা লোক খুব উৎসাহ নিয়ে বললেন।

'আপনাদের কারো সঙ্গে তো আমাদের পরিচয় হয়নি। আমার নাম টিংকু। আর ও হচ্ছে—।' আমাকে দেখিয়ে বলে, 'সুমিত। জি, এবার আপনার পরিচয়টা বলুন।' টিংকু বেঁটে লোকটার দিকে তাকায়।

'আমার নাম বদিউল।'

'জি বদিউল ভাই, আপনি কী যেন একটা কামেল লোকের কথা বলছিলেন। কোথায় থাকেন তিনি, কী করেন। বলেন।' বদিউল ভাইকে টিংকু অনুরোধের স্বরে বলে।

'এখন ঠিক কোথায় আছে বলতে পারব না, তবে খোঁজ করলে বের করতে পারব। ভাইজান, লোকটার যা মারাত্মক ক্ষমতা! একবার হলো কি, আমার এক আত্মীয়ের টেলিভিশন চুরি হয়ে গেল ঘর থেকে। চৌদ্দ ইঞ্চি টেলিভিশন, সাদা-কালো। তো আমার আত্মীয়টা ওই লোকটার কাছে গিয়ে চাল পড়া নিয়ে আসে। তারপর যাকে যাকে তার সন্দেহ হয় তাকে তাকে ওই চালপড়া খাওয়ায়। দশ-পনেরো মিনিট কিছু হয় না। হঠাৎ করে একজন লোক কাশতে থাকে, কাশতে কাশতে তার মুখ দিয়ে গলগল করে রক্ত পড়তে থাকে।'

'আপনি নিজ চোখে দেখেছেন?'

'ঠিক আমি দেখি নাই, আমার আরেক আত্মীয় দেখেছে।'

'পরে কি টেলিভিশনটা পাওয়া গেছে?'

'সেটাও বলতে পারব না আমি।'

মফিজের দিকে তাকিয়ে টিংকু বলে, 'বদিউল ভাই যখন বলছেন, আপনি চালপড়ার খোঁজ করতে পারেন।'

'কিসের চালপড়া! আরেকবার এ রকম হোক, দেখবেন সবাইরে কী খাওয়াই! হালুয়া টাইট কইরা ফালামু সবার।' হনহন করে মফিজ হেঁটে গিয়ে তার রুমে ঢোকে।

সবার জন্য বাথরুম একটা। বাথরুমে ঢুকেই দেখি পানি নেই। কোনায় একটা বালতি আছে, সেটা ভরা আছে। আমাকে বাথরুমে ঢুকতে দেখেই জলিল কিছুটা দৌড়ে এসে বলল, 'এ-ই?'

কথা বলার ঢঙ দেখেই মেজাজটা খারাপ হয়ে গেল। আস্ত একটা দামড়া

পুরুষ, কিন্তু কথা বলে মেয়েদের মতো, হাঁটেও মেয়েদের মতো। বিরক্ত হয়ে বললাম, 'কী?'

'ওই বালতির পানিতে হাত দিবা না কিন্তু।'

'কেন?'

'ওইটা ওনার পানি।'

'ওনার পানি! ওনার পানি মানে কার পানি?' মেজাজ আরো খারাপ হয়ে যায় আমার।

'ওই যে ওনার পানি।'

'আবার ওনার পানি। উনিটা কে? নাম নেই তার?'

'ওই যে গামছা নিয়া কথা বলল।'

'মফিজ ভাইয়ের?'

'হ্যাঁ।'

'তা প্রথমেই মফিজ ভাই বলতে অসুবিধা কী ছিল? ওনার নাম বলার আগে কি ওজু করতে হয়!' মেজাজটা একটু ঠান্ডা করে বলি, 'বাথরুমে পানি নেই, হাতমুখ ধোব কীভাবে?'

'সেটার আমি কী জানি! উনি ম্যানেজার, ওনাকে জিজ্ঞেস করো।' বলেই জলিল কোমর নাচাতে নাচাতে হেঁটে যায়। আমার মনে হলো, ও ইচ্ছে করেই বেশি করে কোমর নাচিয়েছে। দাঁড়া হারামজাদা, তোর কোমর নাচানো দেখিয়ে দেব একদিন। রাগে শরীর জ্বলে যায় আমার।

রুমে ফিরে এসে টিংকুকে পানির কথা বলতেই বলল, 'চল তো, দেখি মফিজ কী বলে?'

মফিজের রুমের সামনে এসে দেখি দরজা বন্ধ। টিংকু দরজায় টোকা দিয়ে বলে, 'মফিজ সাহেব?'

চোখ ডলতে ডলতে দরজা খুলে মফিজ বলে, 'কী ব্যাপার?'

'বাথরুমে তো পানি নেই।'

'পানি নাই তো আমি কী করুম?'

'আপনি পানির ব্যবস্থা করবেন।'

'আমি পানির ব্যবস্থা করুম কীভাবে, আমি কি ওয়াসা?'

'আপনি ওয়াসা না, আপনি এ মেসের ম্যানেজার।'

'ম্যানেজার হইছি তো কী হইছে?'

'ম্যানেজার মানে জানেন তো? ম্যানেজার মানে হচ্ছে, যে সবকিছু

ম্যানেজ করে। আপনি এ মেসের ম্যানেজার, আমাদের এখন পানি দরকার, আপনি পানি ম্যানেজ করে দেন।'

'আমি কোথা থেইকা পানি ম্যানেজ করুম?'

'সেটার আমরা কী জানি! আমাদের বাথরুমে যেতে হবে, গোসল করতে হবে, হাগা-মুতা করতে হবে। পানি পাব কোথায় আমরা? আজ আপনার গামছায় প্রস্রাবের গন্ধ পেয়েছেন, প্রয়োজনের সময় পানি না পেলে তো অন্য কিছুর গন্ধ পাবেন।'

'এ মেসে পানি আসে ভোররাতে, এক ঘণ্টা থাকে, তারপর চইলা যায়। আপনাদের ভোররাতে উঠতে হইব, যা কিছু করার তখন কইরেন।' মফিজ দরজা লাগাতে নেয়। সঙ্গে সঙ্গে টিংকু বলে, 'দরজা লাগাচ্ছেন কেন আপনি, সমস্যার সমাধান করুন।'

'সমাধান তো করলাম।'

'আপনি কি ভোররাতে ওঠেন?'

'আমি কখন উঠি না-উঠি সেইটা আমার ব্যাপার।'

'ওকে। বাথরুমের বালতিতে যে পানি জমিয়ে রাখেন, কাল থেকে সেই পানি আপনি পাবেন না। যদি পানি পেতে চান, একটা ট্যাংকির ব্যবস্থা করুন, পানি এলে সেটাতে পানি জমিয়ে রাখার ব্যবস্থা করুন। ভোররাতে গোসল সারে বিবাহিত লোকজন আর চোরেরা। আমরা বিবাহিতও না, চোরও না।' টিংকু আর কোনো কথা না বলে চলে আসে।

ঘরে এসেই টিংকু একটা পোস্টার মেলে ধরে বলে, 'কাল একটা দেয়ালের সঙ্গে এই পোস্টারটা লাগানো ছিল। অফিসের ঠিকানা, ফোন নম্বর, সব দেওয়া আছে। আজ আমরা সেখানে যাব।'

'এটা তো মাউথওয়াশ কোম্পানির ঠিকানা। ওখানে গিয়ে কী করব আমরা?' হতাশ স্বরে বলি আমি।

'একটা কিছু তো করতে হবে আমাদের। আমরা মাউথওয়াশ বিক্রি করব।' টিংকু বেশ আশা নিয়ে বলে।

'দিনে কয়টা মাউথওয়াশ বিক্রি করতে পারব আমরা?'

'অনেকগুলো। এর জন্য একটু বুদ্ধি খরচ করতে হবে। সম্ভবত সেই বুদ্ধিটা ওই কোম্পানিই আমাদের দেবে।'

'তুই শিওর?'

'ফিফটি-ফিফটি।'

শব্দ করে ঘরে ঢুকে দুই থালা খিচুড়ি এনে সামনে রেখে জলিল বলে, 'তোমরা নতুন আসছ বইলা আজ খাবারটা এখানে দিয়া গেলাম। এর পর থিকা কিন্তু রান্নাঘর থিকা আইনা খাইতে হবে।' জলিল চলে যেতে নিতেই ঘুরে দাঁড়ায়, তারপর টিংকুর দিকে তাকিয়ে বলে, 'এ-ই।'

রাগী চেহারা করে জলিলের দিকে তাকায় টিংকু।

'তোমাকে কী বইলা ডাকব, বলো তো?'

আগের মতোই তাকিয়ে থাকে টিংকু।

'বললে না, কী বইলা ডাকব তোমাকে?'

'কী বলে ডাকতে চাও তুমি?'

'সেটা আমি কী করে বলুম, তুমি বইলা দাও।'

'আমি বলব?' টিংকু একটু থেমে খুব স্বাভাবিকভাবে বলে, 'আব্বা বলে ডেকো আমাকে। ঠিক আছে!'

মাউথওয়াশ কোম্পানিটির ম্যানেজার সবকিছু বুঝিয়ে দিলেন আমাদের। তারপর কোথায়, কীভাবে জিনিসটা বিক্রি করতে হবে, তার একটা প্রশিক্ষণও দিয়ে দিলেন কয়েক মিনিটের ভেতর। কোনো জামানত দিতে হলো না, শুধু স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানাটা লিখে দিতে হলো। জিনিসটার দাম পঞ্চাশ টাকা, এর ওপরে যত টাকা বিক্রি করতে পারব, সব আমাদের। তবে একটা শর্ত—দিনে কমপক্ষে দশটা মাউথওয়াশ বিক্রি করতে হবে।

বড় একটা মার্কেটের সামনে এসে দাঁড়ালাম আমরা। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর স্মার্ট একটা মেয়ে গাড়ি থেকে নেমে আসতেই টিংকু একটু সোজা হয়ে দাঁড়াল। মেয়েটা আমাদের বয়সীই। সুন্দরী বললে মেয়েটাকে একটু ছোট করা হয়, অনিন্দ্যসুন্দরী সে। মেয়েটা মার্কেটের ভেতর ঢুকতে যাচ্ছে। এমন সময় টিংকু তাকে থামিয়ে বলল, 'ম্যাডাম, আপনার জন্য একটা জিনিস ছিল।'

মেয়েটা একটু থেমে বলল, 'কী জিনিস?'

'সারা দিন আমাদের কথা বলতে হয়, আর কথা বলতে গেলেই মুখটা হাঁ করতে হয়। মুখে তখন আমাদের ময়লা ঢোকে, সেই ময়লার সঙ্গে জীবাণু ঢোকে, ফাঙ্গাস জমে, মুখটা কেমন যেন হয়ে যায় আমাদের। কথাটা কি ঠিক বলেছি ম্যাডাম?' টিংকু আশাবাদী হয়ে মেয়েটার দিকে তাকায়।

'ঠিক।'

'ম্যাডাম, আপনিও তো একজন মানুষ। আপনারও তো সারা দিন অনেক কথা বলতে হয়।'

'তা তো বলতে হয়ই।'

'স্বাভাবিকভাবেই আপনার মুখেও কিন্তু তখন ময়লা ঢোকে। ময়লার সঙ্গে জীবাণু ঢোকে, ফাঙ্গাস জমে, মুখটা কেমন যেন গন্ধ গন্ধ হয়ে যায়।'

'হ্যাঁ, তবে সব সময় না, মাঝে মাঝে হয়।'

'তখন আপনার কেমন লাগে ম্যাডাম?'

'খারাপ লাগাই স্বাভাবিক।'

'আপনার কথা শুনে ভালো লাগল ম্যাডাম। আপনি যেমন, আপনার কথাবার্তাও তেমন। আপনি একজন ভালো মানুষও। আপনার মতো ভালো মানুষের মুখ যেমন-তেমন হয়ে যাবে, সেটা তো ঠিক না, ম্যাডাম। মানুষই বা ভাববে কী!' কোম্পানির দেওয়া ব্যাগ থেকে টিংকু একটা মাউথওয়াশের প্যাকেট বের করে মেয়েটার সামনে মেলে ধরে বলে, 'আপনার মুখ যেন সব সময় সুবাসে ভরে থাকে, তাই আপনার জন্য এই মাউথওয়াশটি নিয়ে এসেছি আমি।'

'না না, মাউথওয়াশ লাগবে না আমার।'

'ম্যাডাম, এটা খুবই কার্যকরী এবং মুখের দুর্গন্ধ তাড়াতে সহায়ক।'

'বললাম না, আমার প্রয়োজন নেই এটার!'

'ম্যাডাম, দাম কিন্তু খুব বেশি না। মাত্র তিন শ পঞ্চাশ টাকা।'

'বললাম তো, এসবের প্রয়োজন নেই আমার। বললাম না, আমার মুখে সব সময় ওরকম কিছু হয় না।'

'এখন সব সময় হয় না, পরে যে হবে না, সেটা কীভাবে বলবেন আপনি?' টিংকু হেসে হেসে বলে, 'ম্যাডাম, আমাদের কোম্পানির প্রচারের জন্য আমরা লাভ কম করি, তাতে আমাদের বিক্রি হয় বেশি। যান, আপনার জন্য পঞ্চাশ টাকা ছাড়, মাত্র তিন শ টাকা দাম। পুরো এক বছর ব্যবহার করতে পারবেন এটা। তিন শ টাকায় তিন শ পঁয়ষট্টি দিন, প্রতিদিন এক টাকারও কম পড়বে ম্যাডাম।'

মেয়েটি বেশ বিরক্ত হয়ে বলল, 'আহ্, আপনি তো বেশ বিরক্ত করছেন!'

'স্যরি ম্যাডাম, বিরক্ত করার জন্য।' কোম্পানির সেই ব্যাগ থেকে টিংকু একটা চকলেট বের করে বলে, 'ঠিক আছে ম্যাডাম, মাউথওয়াশ নিতে হবে

না আপনাকে। তবে কোম্পানির পরিচিতির জন্য শুভেচ্ছাস্বরূপ একটা চকলেট রয়েছে আপনার জন্য।'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও চকলেটটি হাতে নিল মেয়েটি। তারপর চলে যেতে নিতেই টিংকু আবার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'ম্যাডাম, চকলেটটা আমাদের কোম্পানির নতুন তৈরি। আপনি যদি এটা খেয়ে এখনই ভালো-মন্দ কিছু একটা বলতেন, তাহলে আমরা তাৎক্ষণিক বুঝতে পারতাম, চকলেটটা আসলে কেমন?'

আগের মতোই অনিচ্ছা নিয়ে আস্তে আস্তে চকলেটের মোড়কটা খুলে মুখে পুরল মেয়েটি। তিন সেকেন্ড পরই ওয়াক করে ফেলে দিয়ে সে বলল, 'ওফ্, কী বাজে চকলেট, কী বিশ্রী গন্ধ এটার! এটা একটা চকলেট হলো! পুরো মুখটাই গন্ধ হয়ে গেছে, আর—।'

মেয়েটিকে কথা শেষ করতে না দিয়েই টিংকু বলে উঠল, 'ম্যাডাম, এবার নিশ্চয়ই আপনার একটি মাউথওয়াশ কেনা প্রয়োজন!'

দশটা না, সতেরোটা মাউথওয়াশ বিক্রি করে আমরা যখন মেসে এসে পৌঁছলাম, রাত তখন নয়টা। বাড়িওয়ালা চাচা বসে আছেন গেটের সামনে। জলিল ঘাড় টিপছে তার। তিনি কিছু বলার আগেই বাড়িভাড়ার বাকি টাকাগুলো তার হাতে দিয়ে টিংকু বলল, 'স্যার, আপনার সঙ্গে জরুরি কিছু কথা আছে আমার।'

জিভে আঙুল ঠেকিয়ে টাকা গুনতে গুনতে বাড়িওয়ালা চাচা বললেন, 'তোমার সঙ্গেও আমার কিছু জরুরি কথা আছে।'

'তাই নাকি!' টিংকু একটু নরম গলায় বলে, 'তাহলে আপনি আগে বলবেন, না আমি আগে বলব?'

'তুমিই আগে বলো।'

টিংকু কেমন যেন মোচড়াতে থাকে। তারপর শরম পাওয়া গলায় বলে, 'কথাটা ব্যক্তিগত তো, তাই কেবল আপনাকেই বলতে চাই কথাটা।'

'জলিল, তুই এখন যা।'

জলিল চলে যেতেই টিংকু পকেট থেকে পাঁচ শ টাকার একটা নোট বের করে বাড়িওয়ালার হাতে দিয়ে বলে, 'স্যার, আমরা অল্প অল্প করে কামাই করা শিখছি। প্রতিদিন অল্প অল্প করে কিছু টাকা জমাও হয়।'

'খুবই ভালো কথা।'

'কিন্তু একটা সমস্যাও আছে।'

'কী?'

'টাকাগুলো কোথাও রাখা দরকার। কিন্তু আমাদের তো কোনো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নেই, তাই টাকাগুলো আপনার কাছে রাখতে চাই।'

'আমার কাছে!'

'জি। আপনি হচ্ছেন আমাদের মুরব্বি, আপনিই আমাদের ব্যাংক।'

'তা নাহয় রাখলা, টাকাগুলার হিসাব রাখব কে?'

'আপনার কাছে রাখব, আবার সেই টাকার হিসাব রাখব, এটা একটা লজ্জার কথা হলো না! স্যার, আমাদের কোনো হিসাব রাখার দরকার নেই।'

'ঠিক আছে। প্রয়োজনে আবার টাকাগুলা চেয়ে নিয়ো।'

'তা তো বটেই, তা তো বটেই।' টিংকু একটু থেমে বলে, 'স্যার, আপনি যেন কী একটা জরুরি কথা বলতে চাইছিলেন?'

'না, তেমন কিছু না। ওই মফিজ্যা বলল, পানি নিয়া তোমরা নাকি কী একটা ঝগড়া-কাইজ্জা করছ। ঠিক আছে, কাল সকালে একটা ট্যাংকি কিনা দিমু আমি। তখন আর পানির অসুবিধা হইব না। এত দিন কেউ তেমন কিছু বলে নাই তো, তাই কেনা হয় নাই। যাও যাও, বাসার ভেতর যাও।'

বাসার ভেতর ঢোকার আগেই টিংকুকে আমি বললাম, 'হঠাৎ ওই খাট্টাস লোকটার কাছে টাকা জমা রাখলি!'

টিংকু আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলল, 'অদ্ভুত একটা কারণ আছে, অদ্ভুত!'

ছায়াটা দেখে চমকে উঠি আমি। চোখ পিটপিট করে ভালো করে তাকিয়ে দেখি, ঠিক ছায়া নয়, কেউ একজন আমাদের রুমের ভেতর হাঁটছে। রাত এখন কয়টা বাজে, বুঝতে পারছি না। হাতের কাছে কোনো ঘড়িও নেই যে সময়টা দেখে নেব। অন্ধকার চারদিকে, কেবল জানালার ওপরের খোলা অংশ দিয়ে আসা মৃদু চাঁদের আলোয় অল্প অল্প দেখা যাচ্ছে ঘরের ভেতরটা।

চোখ দুটো ভালো করে মেলে দিলাম। না, লোকটাকে ঠিক চেনা যাচ্ছে না। গাঢ় কালো ছায়ার মতো কেবল ঘরের এপাশ থেকে ওপাশ সে হাঁটাহাঁটি করছে, মাথাটা নিচু করে হাঁটছে, খুব আপন-মনে হাঁটছে। কী একটা রোগ নাকি আছে, সেই রোগে যে আক্রান্ত হয়, সে নাকি রাতে ঘুমের ঘোরে হাঁটে। লোকটা কি সেই রোগে আক্রান্ত?

লোকটা হাঁটছে। অল্প অল্প খস খস শব্দ হচ্ছে মেঝেতে। এই খস খস শব্দেই ঘুম ভেঙে গিয়েছে আমার। তারপর চোখ মেলে দেখি, লোকটা হাঁটছে। ঘরের ওই কোনা দিয়ে হাঁটছে সে, এখান থেকে দিব্যি দেখতে পাচ্ছি আমি, কিন্তু চিনতে পারছি না তাকে।

হঠাৎ মনে হলো, চোর না তো? পরক্ষণেই মনে হলো, চোর হলে তো এভাবে হাঁটত না। যত দ্রুত সম্ভব চুরি করে পালিয়ে যেত।

টিংকুর গায়ে হাত রেখে আলতো করে ধাক্কা দিলাম আমি ওকে। এক ধাক্কাতেই চোখে মেলে তাকাল ও। আমি ওর কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বললাম, 'সামনের দিকে তাকা।'

সামনের দিকে তাকাল টিংকু। কিছু দেখতে না পেয়ে বলল, 'কী, সামনে কী আছে, দেখতে পাচ্ছি না তো কিছু।'

'ভালো করে তাকা।'

চোখ ডলে টিংকু আবার সামনের দিকে তাকাল। একটু পর ফিসফিস

করে বলল, 'কে হাঁটে?'

'সেটাই তো বুঝতে পারছি না আমি।'

'কখন থেকে হাঁটছে?'

'একটু আগে হাঁটার খস খস শব্দে ঘুম ভেঙে যায় আমার। ঘুম ভাঙতেই দেখি, লোকটা হাঁটছে।'

'ওরকম মাথা নিচু করে হাঁটছে?'

'হ্যাঁ। কোনো দিকে তাকায়ও না, বসেও না, কেবল হাঁটে।'

শব্দ না করে বিছানা থেকে নামল টিংকু। পা টিপে টিপে লোকটার একেবারে কাছে গিয়ে দাঁড়াল। লোকটা হাঁটছেই, টিংকুকে পাশ কাটিয়ে গেল সে, কিন্তু ফিরে তাকাল না।

লোকটা আবার ঘুরে দাঁড়াল। এবার টিংকুকে পাশ কাটাতে গিয়ে একটু ধাক্কাও খেল ওর সঙ্গে, এবারও ফিরে তাকাল না ওর দিকে। টিংকু বিছানার কাছে ফিরে এসে আমাকে বলল, 'চিনতে পারিসনি লোকটাকে?'

'না তো!'

'বদিউল ভাই।'

'উনি! উনি ওভাবে হাঁটছেন কেন?'

'এটা তো আমারও প্রশ্ন।' টিংকু আমাকে সাথে নিয়ে আবার বদিউল ভাইয়ের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। তিনি পাশ কাটিয়ে যেতেই আমি ওনার হাত ধরতে নিই। এর আগেই টিংকু আমার হাতটা চেপে ধরে বলে, 'বদিউল ভাই কিন্তু ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই হাঁটছেন। হঠাৎ করে ওনার ঘুম ভাঙানো যাবে না। আস্তে আস্তে তার ঘুম ভাঙাতে হবে। না হলে হঠাৎ চমকে উঠে শরীরের কোনো ক্ষতি হতে পারে তার।'

বদিউল ভাই হাঁটছেন, টিংকু আমাকে সাথে নিয়ে ওনার পাশে পাশে হাঁটতে থাকে। হাঁটতে হাঁটতে বদিউল ভাইয়ের গায়ে হাত রাখে টিংকু। আস্তে আস্তে সারা পিঠ বোলাতে থাকে ও। বেশ কিছুক্ষণ পর গলাটা নামিয়ে টিংকু বলে, 'এখন বদিউল ভাইয়ের হাত টেনে ধরব আমি। একটু পর দেখবি, উনি চোখ মেলে তাকাবেন আমাদের দিকে।'

টিংকু হাত টেনে ধরল বদিউল ভাইয়ের। তারপর কিছুদূর হেঁটেও গেলাম আমরা তার সঙ্গে। একটু পর সত্যি সত্যি তিনি চোখ মেলে তাকালেন। তারপর আমাদের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আপনারা?'

বদিউল ভাইয়ের একটা হাত চেপে ধরে টিংকু বলল, 'আপনি একা একা

হাঁটছিলেন বদিউল ভাই?'

'জি। রাতে এভাবে হাঁটতে হয় আমাকে।'

'প্রতি রাতে?'

'হ্যাঁ, প্রায় রাতেই হাঁটি আমি।'

'কেন?'

'ঘরের ভেতর কেমন যেন গুমোট গরম। চলেন, বাইরে কোথাও গিয়ে বসি।'

বাইরে ঝকঝকে জ্যোৎস্না। বেদি বাঁধানো বারান্দায় গিয়ে বসি আমরা। বদিউল ভাই মাথা নিচু করে কী যেন ভাবতে থাকেন। টিংকু তার পিঠে একটা হাত রেখে বলে, 'আপনার কোনো সমস্যা যাচ্ছে বদিউল ভাই?'

'সমস্যা না ভাই, মহা সমস্যা।'

'বলা যাবে আমাদের?'

'গোপন কিছু না, বলা যাবে।' বদিউল ভাই একটু থেমে বলেন, 'মার্ডার কেসে আমার ছোট ভাইটা জেলে আছে।'

'কত দিন ধরে?'

'তা প্রায় দেড় বছর তো হলোই।'

'তিনি সত্যি সত্যি মার্ডার করেছেন?'

'আমার ছোট ভাই, আমি কীভাবে বলি। ওর মতো সরল এবং সোজা ছেলে আমি খুব কম দেখেছি। কারো সঙ্গে গলা উঁচু করে কথা বলত না, আজেবাজে আড্ডা দিত না, কারো সাথে তেমন মিশত না।'

'তাহলে ওনার এ অবস্থা হলো কেন?'

'পাশের গ্রামের এক ফ্যামিলির সঙ্গে আমাদের পূর্বশত্রুতা ছিল। তারা একটা মিথ্যা মামলা সাজিয়ে ওকে ফাঁসিয়ে দিয়েছে। দেড় বছর ধরে ও জেলে আছে।'

'আপানারা জেল থেকে ছাড়ানোর চেষ্টা করছেন না ওকে?'

'করছি না ভাই, করতে করতে ফতুর হয়ে গেছি। জমিজমা যা ছিল সব বিক্রি করা হয়েছে, বাকি আছে কেবল বাড়িটা। গ্রাম ছেড়ে, বউ-বাচ্চা ছেড়ে, বাবা-মা ছেড়ে এই শহরে এসে থাকি। ছোট ভাইটার জন্য এখানে-ওখানে দৌড়ঝাঁপ করি। কিন্তু কোনো ফায়দা হয় না ভাই।'

'কোনো উকিল ধরেছেন আপনি?'

দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বদিউল ভাই বলেন, 'এই উকিলের পেছনেই

তো আমার সব শেষ হয়ে গেল ভাই। আজ দেড় বছর ধরে ওনার পেছন পেছন ঘুরছি, যা করতে বলছেন করছি, যা চাইছেন দিচ্ছি, কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না।'

'অন্য কোনো উকিল ধরলে তো পারতেন।'

'সে সুযোগ পেলাম কোথায় ভাই। তিনি প্রতিদিনই আশ্বাস দেন আজ ছাড়া পাবে, কাল ছাড়া পাবে। সেই আশায় থেকেই তো অন্য আর কারো কাছে যেতে পারি না।'

'কিন্তু রাত করে এই যে আপনি এভাবে হাঁটেন, এটা কেন?'

বদিউল ভাই ম্লান হাসেন। হাসতে হাসতে বিড়বিড় করে কী যেন বলেন তিনি। তা দেখে টিংকু বলে, 'কোনো অসুবিধা থাকলে বলার দরকার নেই ভাই।'

'না, অসুবিধা তেমন নেই। বলতে লজ্জাও লাগছে, কষ্টও হচ্ছে।' বদিউল ভাই আবার ম্লান হাসেন, 'ছোট ভাইটার জন্য প্রতিদিন এত হাঁটতে হয়, আজকাল যা স্বপ্ন দেখি, সেখানেও দেখি প্রচুর হাঁটছি। মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখি, হাঁটতে হাঁটতে আমার ছোট ভাইটাকে খুঁজে পেয়েছি। আনন্দ নিয়ে যেই ওকে জড়িয়ে ধরতে যাই, তখনই ও উধাও হয়ে যায়। ভাইজান—।' বদিউল ভাই ফোঁত করে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলেন, 'একদিন এভাবে হাঁটতে হাঁটতে আমার ছোট ভাইটাকে পেয়ে যাব আমি। আমার বিশ্বাস, ওই সব উকিল-টুকিল দিয়ে কিছু হবে না।'

'সব উকিল কিন্তু এক রকম না, বদিউল ভাই।' টিংকু পা দুটো গুটিয়ে বসে বলে, 'আমি একজন উকিলের গল্প বলি আপনাকে। আমাদের এলাকায় মিনহাজ নামে এক লোক ছিলেন। মোটামুটি সচ্ছল ছিলেন তিনি। আমাদের এলাকার মেইন রাস্তার পাশে ওনার একটা জমি ছিল, সেই জমিটার ওপর চোখ পড়ে আমাদের এক প্রভাবশালী লোকের। দুই নম্বর দলিল করে জায়গাটা তিনি দখল করে ফেলেন। মিনহাজ চাচা কেস করে দেন কোর্টে। তিন বছর কেস চালাতে চালাতে তিনি প্রায় নিঃস্ব হয়ে যান। একসময় সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেন তিনি আর কেস চালাবেন না। কিন্তু যে উকিল সাহেব কেসটা পরিচালনা করছিলেন, বেঁকে বসেন তিনি। কিছুটা জেদি হয়ে তিনি মিনহাজ চাচাকে বলেন, আপনার কোনো টাকা-পয়সা লাগবে না, কেস চালাব আমি। তারপর দুই বছর কেস চালান তিনি এবং জমিটা উদ্ধার করে দেন মিনহাজ চাচাকে। তারও আড়াই বছর পর মিনহাজ চাচার ওই দুই বছরে খরচ হওয়া

দেড় লাখ টাকা ফেরত দিতে যান উকিল সাহেব।' টিংকু একটু হেসে বলে, 'কী বুঝলেন, অনেক ভালো উকিল আছে, তারা ভালো মানুষও।'

বদিউল ভাই দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বলেন, 'মনটা সব সময় খারাপ হয়ে থাকে ভাই।'

'স্বাভাবিক, খুবই স্বাভাবিক। আমার মন বলছে কয়েক মাসের ভেতর আপনার ছোট ভাইটা ছাড়া পেয়ে যাবে, এমনকি এর আগেও পেয়ে যেতে পারে।' টিংকু হেসে হেসে বলে, 'আপনি যদি অনুমতি দেন, আপনার মন ভালো করার জন্য একটা কৌতুক বলতে পারি আমি।'

'বলুন।'

টিংকু একটু সোজা হয়ে বসে বলে, 'বিশিষ্ট ব্যবসায়ী সন্ত্রাসী চোখ ট্যারা মোতালেব ধরা পড়েই জেল খাটল তিন মাস। তারপর জামিন নিয়ে বের হয়ে এসেই সে জানতে পারল, তার সদ্য নিয়োগ করা অ্যাকাউনটেন্ট সই জাল করে ব্যাংক থেকে নগদ পাঁচ লাখ টাকা সরিয়ে ফেলেছে। মাথায় আগুন ধরে যায় ট্যারা মোতালেবের। সে তার পুরো বাহিনীকে অ্যাকাউনটেন্টের পেছনে লেলিয়ে দিয়ে বলে, যেখানেই তারা লোকটাকে পাবে, সেখানেই আটকে যেন খবর দেওয়া হয় তাকে।

সাড়ে তিন মাস পর প্রত্যন্ত এক অঞ্চলে একটা পোড়োবাড়িতে পাওয়া গেল অ্যাকাউনটেন্টকে। ওই পোড়োবাড়ির ভেতর তাকে আটকে রাখতে বলে ট্যারা মোতালেব তার ব্যক্তিগত উকিল ছদরুলকে নিয়ে চলে এলো সেখানে। পৌঁছেই সে দেখল, একটা চেয়ারের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে অ্যাকাউনটেন্টকে। খুনে মেজাজটা আরো চড়ে গেল ট্যারা মোতালেবের। পকেট থেকে দ্রুত পিস্তল বের করে পলাতক অ্যাকাউনটেন্টের মাথার পাশে চেপে ধরে চিৎকার করে বলল, আমার পাঁচ লাখ টাকা কই রাখছস?

ভয়ে চোখমুখ শুকিয়ে গেছে লোকটার। ফ্যালফ্যাল করে কিছুক্ষণ সে তাকিয়ে রইল ট্যারা মোতালেবের দিকে, তারপর দু হাত নেড়ে কী যেন জবাব দিল সে।

ট্যারা মোতালেব আবার চিৎকার করে উঠল। অ্যাকাউনটেন্ট আগের মতোই হাত নেড়ে কী যেন বলার চেষ্টা করল। এভাবে ট্যারা মোতালেবের কয়েকবার চিৎকার আর অ্যাকাউনটেন্টের হাত নেড়ে জবাব দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বোঝা গেল, অ্যাকাউনটেন্ট লোকটা আসলে বোবা, হাত দিয়ে অঙ্গভঙ্গি করে কথা বলে সে।

সৌভাগ্যক্রমে উকিল ছদরুল আবার বোবাদের হাতের ভাষা বুঝতে পারেন। তিনি একটু এগিয়ে এসে ট্যারা মোতালেবকে বললেন, বস্, আমি বোবাদের ভাষা বুঝি, ব্যাপারটা আমার হাতে ছেড়ে দেন। তারপর তিনি আকার-ইঙ্গিত করে অ্যাকাউনটেন্টকে বললেন, টাকা কোথায় রেখেছ তুমি?

অ্যাকাউনটেন্ট হাত নেড়ে নেতিবাচক জবাব দিল, জানি না।

উকিল ছদরুল উত্তরটা ট্যারা মোতালেবকে বুঝিয়ে বলতেই সে আবার হুঙ্কার দিয়ে পিস্তলটা চেপে ধরল অ্যাকাউনটেন্টের মাথায় এবং পিস্তলের ট্রিগারটা টেনে ধরল। সেটা ছেড়ে দিলেই মাথার ভেতরের সবকিছু বের হয়ে যাবে তার।

ভয় পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকাউনটেন্ট আগের মতো হাতের ইঙ্গিতে উকিল ছদরুলকে জানাল, পোড়ো এই বাড়ির পেছনে একটা কাঁঠালগাছের গোড়ায় গর্ত করে রাখা হয়েছে পুরো টাকাটা।

কী বলে হারামজাদা? অ্যাকাউনটেন্টের ভাষা বুঝতে না পেরে আগের চেয়ে চিৎকার করে বলে ট্যারা মোতালেব।

উকিল ছদরুল তখন মুখটা গম্ভীর করে বলল, ও বলেছে, ওকে গুলি করার সাহস নাকি আপনার নাই!'

টিংকুর কৌতুকটা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বদিউল ভাই সামান্য হেসে বলেন, 'তারপর ট্যারা মোতালেব অ্যাকাউনটেন্টকে গুলি করে। ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যায় একদিন, ফলে কেস হয় আর উকিল সাহেব তখন সারা বছর সেই কেস চালান আর ট্যারা মোতালেবের কাছ থেকে টাকা নেন, তাই তো?'

টিংকুও মুচকি মুচকি হাসতে থাকে। হঠাৎ সে কী যেন ভাবতে থাকে। তারপর মুখটা গম্ভীর করে বদিউল ভাইকে বলে, 'আপনার উকিলের কোনো মোবাইল নাম্বার আছে আপনার কাছে?'

'উনি মোবাইল ব্যবহার করেন না। প্রথমে করতেন, কিন্তু ডিস্টার্ব হয় বলে এখন আর করেন না।'

'তাই নাকি!' টিংকু শব্দ করে হাসতে নিয়েই মুখটা স্বাভাবিক করে বলে, 'তার বাসার ঠিকানা?'

'সেটা আছে।'

'সকালে ঠিকানাটা দিয়েন তো, আমার একটু দরকার আছে। একটা ব্যাপারে পরামর্শ করতে হবে একটা উকিলের সঙ্গে।'

'সকালে কেন, এখনই দিচ্ছি আপনাকে।'

ঘুম থেকে খুব সকালে ডেকে তুলল টিংকু আমাকে। তারপর বলল, 'রেডি হয়ে নে, বাইরে যাব।'

'এত সকালে!'

'হ্যাঁ, এত সকালেই যেতে হবে। কাজ আছে।'

দ্রুত রেডি হয়ে বাইরে বের হয়ে এলাম আমরা। পকেট থেকে বদিউল ভাইয়ের দেয়া উকিল সাহেবের ঠিকানা বের করে একবার পড়ে নিল টিংকু। তারপর একটা সিএনজি ঠিক করে বলল, 'মিরপুর যাবে?'

সিএনজিওয়ালা রাজি হলো। আমরা উঠে বসলাম সেটাতে। সকালবেলার ঢাকা শহর, রাস্তা একেবারে ফাঁকা। পনেরো মিনিটের মধ্যে আমরা মিরপুর এসে পৌঁছলাম। আরো পনেরো মিনিট খরচ করে আমরা সেই ঠিকানা অনুযায়ী উকিল সাহেবের বাসাটাও বের করে ফেললাম।

বাসার সামনে দাঁড়িয়ে টিংকু আমাকে বলল, 'তোকে একটা কাজ করতে হবে।'

'কী কাজ?'

'একটু ফাঁকে দাঁড়িয়ে তুই এ বাসাটার দিকে খেয়াল রাখবি। একটুর জন্যও অন্য কোথাও যাবি না। দেখবি, উকিল সাহেব বাসা থেকে বের হয়ে যান কি না। ঠিক আছে?'

'তুই কোথায় যাবি?'

'আমি জরুরি একটা কাজে যাব। আধঘণ্টার মধ্যে এসে পড়ব। উকিল সাহেবরা সাধারণত বেশ সকাল করে বাসা থেকে বের হন। এই উকিল সাহেবও সকালে বের হবেন মনে হচ্ছে। তুই ভালো করে খেয়াল রাখিস।' টিংকু কথাটা বলে চলে যেতে নিতেই আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে, 'তোর কাছে কি টাকা আছে?'

'হ্যাঁ আছে। ওই যে কাল দশটা পাঁচ শ টাকার নোট দিলি না, সেই টাকাগুলোই আছে।'

'দে তো টাকাগুলো। দরকার হতে পারে আমার। বাসায় গিয়ে তোকে আবার ফেরত দেব টাকাগুলো।'

টিংকুর হাতে টাকাগুলো দিতেই ও একটা পাঁচ শ টাকার নোট আমাকে

ফেরত দিয়ে বলল, 'এ টাকাটা রেখে দে, একেবারে খালি-পকেটে থাকা ভালো না।'

চলে যায় টিংকু। আর আমি তাকিয়ে থাকি উকিল সাহেবের বাসার দিকে। পনেরো মিনিট চলে গেল কিন্তু কেউ বের হলো না বাসা থেকে। একটা হকার এসে পেপার ছুড়ে দিল বাসার গেটের ভেতর। গ্রিলের গেটের ফাঁক দিয়ে দেখতে পেলাম, একটা ছোট কাজের মেয়ে এসে নিয়ে গেল পেপারটা।

বিশ মিনিট চলে গেল, আগের মতোই সব। কেউ গেটও খুলল না, বেরও হলো না। আমি অধীর আগ্রহে তাকিয়ে আছি বাসার গেটের দিকে।

প্রায় আধঘণ্টা পর কালো কোট পরা এক ভদ্রলোক বের হয়ে এলেন বাসা থেকে। একটু অপেক্ষা করার পর সিএনজি ঠিক করে কোথায় যেন চলে গেলেন তিনি।

এবার আমি অধীর আগ্রহে তাকিয়ে রইলাম ডানের রাস্তাটার দিকে, যে রাস্তায় টিংকু গেছে আধঘণ্টা আগে। উকিল সাহেব তো বের হয়ে গেলেন, কিন্তু ওর আসার কোনো নামগন্ধ নেই।

ঠিক পঞ্চাশ মিনিট পর একটা সিএনজি থেকে নেমে টিংকু বলল, 'উকিল সাহেব বের হয়ে গেছেন?'

'হ্যাঁ, বেশ কিছুক্ষণ আগে বের হয়ে গেছেন।'

'তুই শিওর?'

'কালো কোট পরে এক ভদ্রলোক বাসা থেকে বের হয়ে গেলেন, আমার যদি ভুল না হয়, উনিই উকিল সাহেব হবেন।'

টিংকু একটু ভেবে বলল, 'হ্যাঁ, উনিই উকিল সাহেব হবেন। তুই এক কাজ কর, এই এক জোড়া ইলিশ মাছ, কফির জার, ভিনেগারের বোতল, আর এই প্যাকেট কয়টা রাখ। আমি একটু ফ্রেশ হয়ে আসি। মাছের বাজারে কাদায় ছড়াছড়ি।'

টিংকু ফ্রেশ হয়ে এসেই ইলিশ মাছ দুটো আর প্যাকেটগুলো হাতে নিল। তারপর উকিল সাহেবের বাসার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলল, 'একটু সাবধানে কাজটা করতে হবে। কাজটা বেশ রিস্কি!'

বাসার গেটের কাছে এসে কলবেলটা ইশারা করে আমাকে দেখিয়ে দিল টিংকু। বেলটা চাপ দিলাম আমি। সেই কাজের মেয়েটা এসে গেটের ওপাশে দাঁড়িয়ে বলল, 'কাকে চান?'

'এটা উকিল সাহেবের বাসা না?'

'জি।'

'ম্যাডাম আছেন?'

'জি, আছেন।'

'ভেতরে গিয়ে ম্যাডামকে বলো, স্যার লোক পাঠিয়েছেন।'

কাজের মেয়েটা দৌড়ে বাসার ভেতর চলে গেল। একটু পর এক মহিলা এসে বললেন, 'আপনাদের কে পাঠিয়েছে?'

'স্যার পাঠিয়েছেন, ম্যাডাম।'

'অ, আমি তো ভেবেছি কোনো মক্কেল আপনারা। মাঝে মাঝেই এটা-ওটা হাতে নিয়ে অনেক মক্কেল আসে তো।'

'আসবেনই তো। স্যারের মতো এত জ্ঞানী উকিল এ তল্লাটে আর কে আছে!'

'আপনারা কি আমাদের চেম্বারে নতুন জয়েন করেছেন?'

'জি।'

'আমাকে তো কিছু বলেনি ও!'

'ব্যস্ত মানুষ, হয়তো ভুলে গেছেন।' টিংকু একটু হেসে হেসে বলল, 'রাস্তায় স্যারের সঙ্গে দেখা। আমাদের দেখে বললেন, কিছু জিনিস কিনে দিই, তোমরা বাসায় একটু পৌঁছে দিয়ো তো। তারপর স্যার বাসার ঠিকানাসহ এ জিনিসগুলো কিনে দিয়ে এখানে পাঠালেন আমাদের।'

'আসুন আসুন, ভেতরে আসুন।'

বাসার ভেতর ঢুকেই টিংকু বলল, 'দুপুরে স্যার নাকি আজ বাসায় খাবেন। ওনার নাকি খুব সরষে ইলিশ দিয়ে ভাত খেতে ইচ্ছে করছে। তাই তিনি এই ইলিশ মাছ, সরষে, ভিনেগার কিনে পাঠালেন। কফির একটা বড় জারও কিনে পাঠিয়েছেন। ম্যাডাম, আমরা এখন আসি।'

'চা খাবেন না?'

'অন্য দিন খাব ম্যাডাম।' টিংকু চলে আসতে নিয়েই ঘুরে দাঁড়ায়, 'ম্যাডাম, একটা জিনিস ভুলে গেছি।' পকেট থেকে নতুন একটা মোবাইল সেটের প্যাকেট বের করে ও বলে, 'স্যার তো মোবাইল ব্যবহার করেন না। কিন্তু আজ বাজারে গিয়ে এ মোবাইলটা পছন্দ হয়ে যায় স্যারের। কিনে ফেলেন এটা। কিন্তু স্যারের সিমটা বোধহয় বাসায়। তাই এটা বাসায় রাখতে বললেন, দুপুরে এসে সিম লাগিয়ে নিয়ে যাবেন।'

বাসা থেকে বের হয়ে এলাম আমরা। এখানে-ওখানে ঘুরে দুপুরের ঠিক

আগে আমরা আবার এসে কলবেল টিপলাম উকিল সাহেবের বাসায়। উকিল সাহেবের স্ত্রী কিছুটা আনন্দ নিয়ে গেটটা খুলতে এসেই হতাশ স্বরে বললেন, 'অ, আপনারা?'

'দুঃখিত ম্যাডাম। স্যার এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, বাসায় আসতে পারবেন না আজ দুপুরে।'

'দুপুরের খাবার?'

'নিয়ে যেতে বলেছেন আমাদের, আর প্রয়োজনীয় কিছু জিনিসও নিয়ে যেতে বলেছেন।' টিংকু খুব স্বাভাবিকভাবে বলে যায়।

'আসুন, ভেতরে আসুন।'

বাসায় ঢুকেই বেশ মনখারাপ করে উকিল সাহেবের স্ত্রী বলেন, 'ছুটির দিন ছাড়া আমরা তো সাধারণত দুপুরে একসঙ্গে খাই-ই না। কবে যে খেয়েছি সেটা মনেও করতে পারছি না। ও বলেছিল, তাই ভেবেছিলাম আজ একসঙ্গে খাব। ঠিক আছে, আপনারা যখন এসেছেন তাহলে দুপুরের খাবারটা খেয়ে যান, তারপর ওর খাবারটা নিয়ে যান।'

'এটার কোনো দরকার ছিল না ম্যাডাম।' বলেই টিংকু ডাইনিং টেবিলে বসে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে আমিও বসে পড়ি।

ইলিশ মাছের বড় একটা টুকরো দিয়ে ভাত খাওয়া শেষ করে টিংকু আঙুল চাটতে চাটতে বলল, 'ম্যাডাম, অনেক দিন পর এত ভালো রান্না খেলাম আর মাছটাও কী চমৎকার স্বাদের!'

উকিল সাহেবের স্ত্রী টিংকুর প্রশংসা শুনেই আরো দু টুকরো মাছ টিংকুর আর আমার প্লেটে দিতেই টিংকু বলল, 'এটার কোনো দরকার ছিল না ম্যাডাম।' বলেই মাছের টুকরো কামড়াতে থাকে সে।

দুজনের খাওয়া শেষ হতেই উকিল সাহেবের স্ত্রী বললেন, 'আপনাদের স্যার খাবারের সঙ্গে কি আর কিছু নিয়ে যেতে বলেছেন?'

'জি, মোবাইলটা নাকি কী একটা দরকার পড়বে বিকেলে, বাসায় যে সিমটা আছে সেটাসহ দিতে বলেছেন মোবাইলটা। ল্যাপটপের ভেতর নাকি কী কী জরুরি ফাইল আছে, সেই ল্যাপটপটা; কয়েকটা প্রয়োজনীয় ছবি তুলতে হবে, তাই ডিজিটাল ক্যামেরাটাও চেয়েছেন। ভালো কথা, আলমারির ডানে না বাঁয়ে কিছু টাকা নাকি রেখেছেন স্যার, কিছু টাকার দরকার পড়েছে স্যারের, স্যার ওই টাকাগুলোও দিতে বলেছেন।'

চার বক্সের একটা বড় টিফিন-ক্যারিয়ার খাবার দিয়ে সাজিয়ে সঙ্গে অন্য

জিনিসগুলোও আমাদের হাতে তুলে দিলেন উকিল সাহেবের স্ত্রী। শেষে একটা খাম হাতে দিয়ে বললেন, 'আপনার স্যার হাজার বাইশেক টাকা রেখে গিয়েছিলেন আলমারিতে, টাকাগুলো এখানে আছে।'

চরম ভদ্র ছেলের মতো জিনিসগুলো নিয়ে বাসা থেকে বের হয়ে এলাম আমরা। তারপর বুক খালি করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লাম সময় নিয়ে। বাসায় ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সারাক্ষণ মনে হচ্ছিল, এই বুঝি উকিল সাহেব এসে পড়লেন, এই বুঝি এসে পড়লেন!

বাসায় ঢুকতেই মফিজ বেশ গম্ভীর গলায় বলল, 'আপনারা কোথায় গেছিলেন? বইলা যাবেন না কাউকে!'

'বাসা থেকে বাইরে গেলে কাউকে বলে যেতে হয় নাকি?' টিংকু সবার দিকে তাকিয়ে বলল।

বদিউল ভাই একটু সোজা হয়ে বসে বললেন, 'না, সে রকম কিছু না। প্রতি সপ্তাহে এই দিনটায় সাধারণত একটা মিটিং করি আমরা সবাই।'

'কিসের মিটিং, বদিউল ভাই?'

'আগামী এক সপ্তাহ আমাদের খাবারের তালিকায় কী কী থাকবে, সেটা নির্ধারণ করা হবে আজকে।'

বারান্দায় মাদুর পাতা আছে, যারা এ মেসবাড়িতে থাকেন, তারা সেই মাদুরের ওপর বসে আছেন সবাই। মফিজ বসে আছে একটু ফাঁকে, তার পাশে দু পা মেয়েদের মতো গুটিয়ে জলিল বসে আছে। অল্প গরম পড়েছে, জলিল একটা হাতপাখা দিয়ে বাতাস করছে মফিজকে।

'স্যরি, আমরা তো ব্যাপারটা জানতাম না। কেউ বলেওনি আমাদের। এ ছাড়া আমরা বাসা থেকে বেরও হয়ে গেছি বেশ সকালে। আমরা আবারও স্যরি, আশা করি আগামী সপ্তাহ থেকে ভুল হবে না।' টিংকু আবার সবার দিকে তাকায়, 'আপনারা মিটিংটা চালিয়ে যান। বাইরে থেকে এসেছি তো, খুব দ্রুত একটু হাতমুখ ধুয়েই চলে আসছি আমরা।'

বাথরুমে ঢুকতে গিয়েই ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখি, নতুন একটা প্লাস্টিকের ট্যাংকি লাগানো হয়েছে বাথরুমের ছোট ছাদের ওপর। বেশ ভালো লাগল। বাড়িওয়ালারা সাধারণত কথা দিলে সহজে কথা রাখেন না, এ বাড়িওয়ালা রেখেছেন।

দ্রুত হাতমুখ ধুয়ে মিটিংয়ে বসলাম আমরা। সঙ্গে সঙ্গে মফিজ বলল, 'সবাই আইসা গেছে, আমরা এখন মিটিং শুরু করুম। খুব আনন্দের একটা সংবাদ হচ্ছে, আমাদের এই বাড়ির মালিক জনাব খবিউর মোল্লা আজ আমাদের মিটিংয়ে উপস্থিত আছেন। যদিও ওনার সময় খুব কম, তবু তিনি কিছুক্ষণের জন্য এখানে থাকবেন এবং তার মূল্যবান মতামত দেবেন।'

তাড়াহুড়ার জন্য খেয়াল করতে পারিনি, সামনের দিকে তাকিয়ে দেখি বারান্দার মাঝখানে একটা চেয়ারে পা তুলে বসে আছেন বাড়িওয়ালা জনাব খবিউর মোল্লা, জলিল পেছনে দাঁড়িয়ে তার ঘাড় টিপছে। টিংকু উঠে দাঁড়িয়ে তাকে একটা সালাম দিয়ে বলল, 'প্রতিটা মিটিংয়েই একটা সভাপতি নির্ধারণ করতে হয়। আমি জানি না, এ সভায় সাধারণত সভাপতি কে হন। যে-ই হন—।'

টিংকুকে থামিয়ে দিয়ে বদিউল ভাই বললেন, 'আমাদের এ মিটিংয়ে বাড়িওয়ালা সাহেব সাধারণত আসেন না। এ মিটিংয়ে সভাপতি সব সময় মফিজ সাহেবই হন।'

'তবে আজকে যেহেতু আমাদের বাড়িওয়ালা স্যার স্বয়ং উপস্থিত আছেন, তিনি তার মূল্যবান সময় নষ্ট করে এখানে বসে আছেন, যত অল্প সময়ের জন্যই আসুন, তবু তিনি তার জ্ঞানের বিশাল ভাণ্ডার থেকে কিছু অন্তত জ্ঞান বিতরণ করবেন আমাদের জন্য। তাই আজকের মিটিংয়ের সভাপতি হওয়ার জন্য আমি আমাদের প্রাণপ্রিয় বাড়ির মালিক জনাব খবিউর মোল্লার নাম প্রস্তাব করছি।' টিংকু কথাটা শেষ করে বুকটা একটু উঁচু করে দাঁড়াল, যেমন রাজনীতির মঞ্চে কোনো চামচা তার নেতার গুণকীর্তন আর চামচামি করে গর্বিত ভঙ্গিতে দাঁড়ায়।

বাড়িওয়ালার দিকে তাকালাম আমি। টিংকুর প্রশংসায় কেমন মুখটা তেলতেলে হয়ে গেছে তার। এ রকম খবিস লোকের প্রশংসা টিংকু যে কীভাবে করতে পারে, আমার মাথায়ই আসে না। তবে আমি এটা জানি, কোনো উদ্দেশ্য ছাড়া টিংকু কোনো কাজ করে না। আল্লাহ জানে, বাড়িওয়ালার কপালে কী আছে!

বদিউল ভাই বসে থেকেই বললেন, 'আমি এ প্রস্তাব সর্বান্তকরণে সমর্থন করছি।'

টিংকু বদিউল ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বদিউল ভাই, বেয়াদবি নেবেন না।' তারপর বাড়িওয়ালার দিকে তাকাল টিংকু, 'তিনি আমাদের বাড়ির মালিক, তিনি মুরব্বি মানুষ, আমরা যে যা-ই বলি না কেন, একটু দাঁড়িয়ে সেই কথাটা বলব। এতে তাকে সম্মান দেওয়া হবে। জ্ঞানী লোকেরা বলেছেন না, যে অন্য জ্ঞানী লোককে সম্মান করে সে নিজেও জ্ঞানী।'

ঝট করে উঠে দাঁড়ালেন বদিউল ভাই। তারপর আগের মতোই বললেন, 'আমি এ প্রস্তাব সর্বান্তকরণে সমর্থন করি।'

'আমরা সমর্থন পেলাম। সুতরাং আমাদের আজকের সভার সভাপতি জনাব খবিউর মোল্লা। আসুন, আমরা এই আনন্দে খুব জোরসে একটা হাততালি দিই।' টিংকু মুখটা হাসি হাসি করে বলল।

সবাই হাততালি দিল, জলিলও দিল। তবে জলিলের হাততালি ঠিক হাততালি মনে হলো না, মেয়েদের মতো কেবল হাত দুটো ঠোকাঠুকি করল ও। সম্ভবত এই অমনোযোগী হাততালি দেয়ার একটা কারণও আছে। জলিল এত মনোযোগ দিয়ে টিংকুর দিকে তাকিয়ে আছে, কোনো প্রেমিকাও বোধহয় কোনো প্রেমিকের দিকে এত গভীর আগ্রহে তাকিয়ে থাকে না।

মফিজ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমাদের সময় কম, আজকের মিটিংটা আমি শুরু করতে যাইতেছি। প্রথমেই— ।'

টিংকু হাত দিয়ে ইশারা করে মফিজকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'মফিজ সাহেব, আপনার জানা উচিত, কোনো মিটিং শুরু করার আগে সভাপতির অনুমতি নিতে হয়।'

বাড়িওয়ালার দিকে তাকালাম আমি। কেমন যেন টিংকুর প্রতি কৃতজ্ঞতায় তার চেহারাটা চকচক করছে। খুব আদুরে দৃষ্টিতে তিনি তাকিয়ে আছেন টিংকুর দিকে।

মফিজ খুক্ করে একটু কেশে আবার শুরু করল, 'সভাপতি সাহেবের অনুমতি নিয়া আমি আজকের মিটিংটা শুরু করতে চাই। প্রথমেই আমি আগামী সপ্তাহের খাবারের তালিকা নিয়া আলোচনা করতে চাই। তারপর খাবারের দাম— ।'

হাত দিয়ে ইশারা করে টিংকু আবার মফিজকে থামিয়ে দিল। তারপর সবার দিকে তাকিয়ে বলল, 'না, প্রথমে মিটিং শুরু করার আগে একটা ধন্যবাদ প্রস্তাব আনতে চাই আমি।'

'কিসের ধন্যবাদ প্রস্তাব?' কথা বলার সময় টিংকু কর্তৃক দুবার বাধা পেয়ে বেশ রেগে গেছে মফিজ। সেটা ওর চেহারা দেখে বোঝা না গেলেও, গলার স্বরে বোঝা যাচ্ছে।

'সাধারণত কোনো বাড়িওয়ালা বাড়ির কোনো কিছু নষ্ট হলে সহজে সেটা মেরামত করতে চান না, কোনো কিছু দিতে চাইলে কয়েক মাস ঘুরিয়ে সেটা দেন। কিন্তু আমাদের এই মহান বাড়িওয়ালা কালকে আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তিনি আমাদের সবার কল্যাণের জন্য একটা পানির ট্যাংকি কিনে দেবেন, আজ বাইরে থেকে বাসায় পৌঁছেই দেখি, পানির ট্যাংকি উপস্থিত। আসুন, আমরা আরো একবার হাততালি দিয়ে আমাদের এই মহান বাড়িওয়ালাকে ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতা জানাই।'

সবাই হাততালি দিতে লাগল। আমিও দিতে লাগলাম, কিন্তু সেটা যতটুকু মনোযোগ দিয়ে করছিলাম, তার চেয়ে বেশি মনোযোগ দিয়ে আমি টিংকুকে দেখছিলাম। এই যে এত তেল, এত চাটুকারিতা, এর মূল্য যে ও কীভাবে আদায় করবে! আমি নিজেই কিছুটা আতঙ্কিত হয়ে পড়ছি।

মফিজ আবার শুরু করল, 'সভাপতি সাহেবের অনুমতি নিয়া আমি জানাইতে চাই, আগামী সপ্তাহে আমাদের খাবারের তালিকায় আছে আলুভর্তা, মসুরের ডাল, ছোট মাছ, সবজি, শাক আর একটা বড় মাছ। সাধারণত মাসের চার সপ্তাহের চার দিন আমরা চার রকমের খাবার খাই। এক সপ্তাহে খাই বড় মাছ, এক সপ্তাহে গরুর মাংস, আরেক সপ্তাহে মুরগির মাংস, শেষ সপ্তাহে ডিম। আমাদের এই সপ্তাহে পড়ছে বড় মাছ। এখন আমার প্রশ্ন, এই সপ্তাহে আমরা কী মাছ খাব?'

পাশ থেকে একজন বলে উঠলেন, 'ইলিশ মাছ খাব।'

টিংকু সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'আপনি বসে বললেন কেন ভাই। বললাম না, আমরা আজ যে কথাই বলি না কেন, আমাদের আজকের সভাপতি জনাব খবিউর মোল্লার সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে সেই কথাটা বলব!'

লোকটি দাঁড়িয়ে উঠে বলল, 'আমরা এ সপ্তাহে ইলিশ মাছ খাব।'

মফিজ খ্যাক্ করে উঠে বলল, 'অ্যা, ইলিশ মাছ খাইবেন। ইলিশ মাছের দাম কত, জানেন?'

'আপনি ওভাবে কথা বলছেন কেন!' টিংকু একটু গম্ভীর হয়ে বলে, 'একজন মানুষ ইলিশ মাছে খেতে চাইতেই পারে, আপনি তাকে বুঝিয়ে বলবেন, কিন্তু রাগ করলে তো হবে না। স্যার— ।' টিংকু বাড়িওয়ালার দিকে তাকিয়ে বলে, 'আপনি কী বলেন?'

'তুমি সত্য বলছ।' বাড়িওয়ালা বেশ কয়েকবার মাথা ঝাঁকিয়ে সমর্থন জানিয়ে বলেন।

যাক, টিংকুর তেল একটু একটু করে কাজে লাগছে। টিংকুর দিকে তাকালাম আমি। ও দাঁড়িয়ে আছে, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছে ও। ওর মুখটা মুচকি মুচকি হাসিতে ভরে গেছে।

'সভাপতি সাহেবের অনুমতি নিয়ে আমি আরো একটা জিনিস জানতে চাই।'

বাড়িওয়ালা বেশ উৎসাহী হয়ে বললেন, 'বলো বলো।'

'আমি জানতে চাই, প্রতি সপ্তাহে এই যে এতগুলো মানুষের বাজার করতে হয়, সেটা কে করেন?'

'আমি করি।' মফিজ একটু শব্দ করে বলে।

'আমার একটা প্রস্তাব আছে।' টিংকু বাড়িয়ালার দিকে আবার তাকিয়ে বলে, 'যদি আপনি অনুমতি দেন।'

'অনুমতি দিলাম, তুমি বলো।'

'থ্যাংক ইউ স্যার।'

'কী বললা?' বাড়িওয়ালা বেশ উৎসাহী হয়ে বলেন।

'আপনাকে ধন্যবাদ দিলাম স্যার।'

'ও, আচ্ছা।'

'আমাদের এই পৃথিবীটা প্রতিদিন বদলে যাচ্ছে, বদলে যায়। আমাদের দেশে একবার খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী হন, আরেকবার শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হন। আমেরিকায় একবার বুশ হন, আরেকবার বারাক ওবামা হন। প্রায় এ রকম অদল-বদল হয়। আমি বলতে চাইছি, অনেক দিন ধরেই তো আমাদের এখানে একজনই বাজার করছে। এবার কয়েক দিন অন্যজন করুক।'

মফিজ চিৎকার করার মতো করে বলে, 'অন্যজন করব ক্যান, আমার পরবলেম কী?'

টিংকুর কিছু বলতে হলো না, তার আগেই বাড়িওয়ালা বললেন, 'ওই পোলা ঠিকই কইছে। একজনই সারা জীবন বাজার করব, এইটা ঠিক না। আজ থেইকা অন্যজন বাজার করব। কয়েক দিন পর আরেকজন করব।' বাড়িওয়ালা টিংকুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি এ কয়দিনের জন্য কার নাম প্রস্তাব করো?'

বদিউল ভাইয়ের দিকে তাকাল টিংকু। মাথা নিচু করে বসে আছেন তিনি। টিংকু তার দিকে এগিয়ে গিয়ে একটা হাত ধরে দাঁড় করিয়ে বলল, 'আজ থেকে ইনি বাজার করবেন।'

বাড়িওয়ালা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'আমি সমর্থন করলাম। এখন থেইকা আপনারা আপনাদের সপ্তাহের খাবারের টাকা জমা কইরা ওনার কাছে দিবেন।'

'থ্যাংক ইউ স্যার।'

'কী বললা?'

'আপনাকে ধন্যবাদ দিয়েছি স্যার।'

'অ।'

'স্যার— ।' টিংকু একটু হাত কচলিয়ে বলে, 'আমি আরেকটা কথা বলতে চাই।'

'বলো, কোনো সমস্যা তো নাই।'

'আপনি আজ আমাদের এই মিটিংয়ে উপস্থিত থেকেছেন। আপনার সম্মানার্থে আমি আমার নিজের টাকা দিয়ে কাল চার-পাঁচটা বড় ইলিশ মাছ কিনতে চাই। সবাই মিলে খাব, আপনাকেও কাল থাকতে হবে স্যার।

'আমারে আবার ক্যান?'

'একটা ভালো মাছ খাব, সেটা আপনাকে রেখে খেতে পারব আমরা!' টিংকু চমৎকারভাবে হাত কচলায় আর বলে।

বাড়িওয়ালা চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ান। সঙ্গে সঙ্গে সবাই উঠে দাঁড়ায়। বাসার চারপাশটায় একবার তাকিয়ে তিনি বের হয়ে যেতে নিতেই টিংকু গলা নামিয়ে বলল, 'স্যার, আজও কিছু টাকা এসেছে হাতে, যদি সেগুলো একটু রেখে দিতেন আপনার কাছে।'

'রাখুম তো, কিন্তু হিসাব তো রাখতে পারুম না।'

'হিসাব রাখতে হবে না স্যার। আপনি হচ্ছেন সজ্জন। আপনি কখনো কাউকে ঠকাবেন না।' টিংকু পকেট থেকে টাকা বের করে বাড়িওয়ালার হাতে দেয়। তিনি সেগুলো নিয়ে তার পাঞ্জাবির পকেটে ঢোকান। তারপর চলে যেতে নিতেই তিনি ঘুরে দাঁড়িয়ে টিংকুকে বলেন, 'সময় পাইলে তুমি আমার বাসায় আইসো তো, তোমার সঙ্গে জরুরি কিছু কথা আছে আমার।'

'জি স্যার।' টিংকু হেসে হেসে বলে। কিন্তু বাড়িওয়ালা চলে যায়, সময় চলে যায় কয়েক ঘণ্টা, আকাশে তারা ওঠে, চাঁদ ওঠে—টিংকুর মুখের হাসি আর শেষ হয় না, রহস্যময় হাসি!

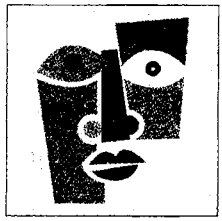

জলিল ফিসফিস করে বলার মতো করে বলল, 'এ-ই।'

পরপর তিনবার সে টিংকুকে ডাকল। কিন্তু ও ঘুমিয়ে আছে আগের মতোই, গভীর ঘুম। আমার ঘুমটা এখন আধো পর্যায়ের, জলিলের কথা শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু চোখ মেলতে পারছি না।

কাল রাত দুইটা পর্যন্ত বিছানায় যাইনি আমরা। অনেক কিছু নিয়ে আলোচনা করেছি। বিছানায় যেতে যেতে ভোর হয়ে গিয়েছিল। ঘুমানোর আগে টিংকু বলেছিল, আজ একটু বেশি করে ঘুমাবে সে। জলিলকেও জানিয়ে দিয়েছিল সেটা, সে যেন সকালের নাশতা করার জন্য না ডাকে, অন্তত দশটার আগে যেন না ডাকে। সম্ভবত জলিল সেটা ভুলে গেছে।

জলিল আরেকবার ডাক দিতেই চোখ মেলে তাকালাম আমি। বালিশের নিচ থেকে হাতঘড়িটা বের করলাম, আটটা বেজে বিশ মিনিট। জলিল আবার ডাকতে যাচ্ছিল, তার আগেই আমি চোখ দিয়ে ইশারা করে ডাকতে নিষেধ করলাম ওকে। সঙ্গে সঙ্গে জলিল বলল, 'ডাকব না, একটা পরি আসছে!'

'পরি!'

'হ্যাঁ, পরি। সবই আছে, শুধু ডানা নাই।'

'এসব কী বলছ তুমি, জলিল?'

'ক্যান, আমার কথা বোঝা যায় না?'

'বোঝা যায় তো। কিন্তু পরিটা কে?'

'তার আমি কী জানি! একটা সাদা ধবধবে গাড়ি নিয়া আইসা বাসার সামনে থামল, তারপর আমাকে দেইখা বলল, টিংকু সাহেব আছেন?'

'তুমি কী বলেছ!'

'যা সত্য তা-ই বলছি। বলছি, ঘুমায়া আছে।'

'টিংকু না তোমাকে দশটার আগে ডাকতে নিষেধ করেছে?'

'জানি তো। ওই পরিকেও সেইটা বলছি। উনি বলছেন, অসুবিধা নাই, গাড়ির ভিতরে বইসা অপেক্ষা করবেন তিনি।'

'বাসার ভেতর আনলে না কেন?'

'এই বাসার ভিতরে!' জলিল মেয়েদের মতো হাসতে হাসতে বলে, 'এই বাসার ভিতরে মশা, তেলাপোকা আর ইঁদুর মানায়। ওই রকম পরি আইলে এই বাসাটা লজ্জায় ভাইঙ্গা পড়ব।'

'কী জন্য এসেছে, বলেছে তোমাকে কিছু?'

'অত কথা কওয়ার সময় কোথায় আমার। তা ছাড়া ওই পরিকে দেইখা পিত্তিটা ক্যান যেন জ্বইলা গেছে আমার।'

'কেন?'

'ও তুমি বুঝবা না। তুমি এখনো দুধের বাচ্চা আছ। বড় হও, তারপর বুঝতে পারবা।' কথাটা বলেই হুহ্ করে একটা শব্দ করে কোমড় নাচাতে নাচাতে চলে যায় জলিল।

টিংকুর মাথায় হাত রেখে আমি ওকে ডাকতে থাকি, 'টিংকু।' পাশ ফিরে শোয় ও। চোখও মেলে না, কথাও বলে না।

আমি আবার ডাক দিই ওকে। এভাবে ঝাড়া সাত মিনিট ডাকার পর টিংকু আধো চোখ মেলে বলে, 'ডাকছিস কেন?'

'কে যেন এসেছে।'

'কে এসেছে?'

'আমি জানি না। জলিল বলল, একটা মেয়ে নাকি এসেছে।'

'মেয়ে! মেয়ে আসবে কোথা থেকে। তাও আবার এখানে। এই ঢাকা শহরে কোনো পরিচিত মেয়ে নেই আমার। যারা আছে তারা আবার এই ঠিকানাটা জানে না। তুই গিয়ে দেখ তো, কে এসেছে।'

'আমি দেখতে পারব না, তোর কাছে এসেছে, তুই গিয়ে দেখে আয়।' আমি আবার শুয়ে পড়ি।

টিংকু উঠে বসে বিছানা থেকে, আমাকেও ওঠায়। বাথরুমে গিয়ে ঝটপট রেডি হয়ে বাইরে বের হয়ে আসি আমরা। সত্যি সত্যি একটা সাদা গাড়ি থেমে আছে বাসার সামনে। আমাদের দেখেই দরজা খুলে গেল গাড়িটার।

তারপর গাড়ি থেকে যে মেয়েটা বের হয়ে এলো, তাকে দেখেই চোখ বড় বড় হয়ে গেল আমাদের। পরশুদিন কৌশল করে যে মেয়েটার কাছে মাউথওয়াশ বিক্রি করেছিল টিংকু, এ হচ্ছে সেই মেয়ে।

তাকে দেখে আমরা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছি। তা দেখে মেয়েটা নিজেই এগিয়ে এলো আমাদের দিকে। তারপর টিংকুর সামনে এসে বলল, 'চিনতে পেরেছেন আমাকে?'

টিংকু একটু কাঁপা স্বরে বলল, 'জি।'

'চিনতে না পারার অবশ্য কথা নয় আপনার। কারণ আপনি খুব বুদ্ধিমান। আমি অনেক দিন ধরে আপনার মতো একজন বুদ্ধিমান ছেলে খুঁজছিলাম।' মেয়েটা বেশ আগ্রহী হয়ে বলে।

'আপনি আমার ঠিকানা পেলেন কোথায়?'

'এর জন্য আমাকে কাল সারা দিন পরিশ্রম করতে হয়েছে। আপনি যে মাউথওয়াশটা বিক্রি করেছেন আমার কাছে, সেখানে কোম্পানির ঠিকানা লেখা আছে। সেখানে গিয়ে অনেক কষ্টে আপনার এই ঠিকানাটা বের করতে হয়েছে আমাকে।'

'তাই!' টিংকু কিছুটা আতঙ্কিত গলায় বলে, 'তা আমাকে আপনার কী দরকার?'

'সেটা এখানে বলতে চাইছি না। আপনার যদি কোনো আপত্তি না থাকে, আপনি তাহলে আমার গাড়িতে আসতে পারেন। একটা ভালো ফাস্টফুডের দোকানে বসে আমরা কথা বলব।'

টিংকু হেসে বলে, 'ভয়ে আসব, না নির্ভয়ে?'

'বুদ্ধিমান মানুষরা কখনো ভয় পায় না।'

'আমার সঙ্গে আরেকজন এলে কি কোনো অসুবিধা হবে?'

'না।'

ফাস্টফুডের দোকানে এসে কোনার একটা টেবিল দেখে সেখানে বসলাম আমরা। তারপর মেয়েটি টিংকুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার নাম লিজা। আমাকে একটা কাজ করে দিতে হবে আপনাকে। আপনি বুদ্ধিমান, আপনি পারবেন। এর জন্য আমি আপনাকে নগদ দুই লাখ টাকা দেব।'

'কাজটা কী?'

ঝাড়া পনেরো মিনিট লিজা বলে গেল, আমরা সেটা শুনলাম। কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে টিংকু বলল, 'কাজটা করা কঠিন কিছু না। তবে অনেক বুদ্ধি খরচ করতে হবে।'

'সে জন্যই তো আপনাকে খুঁজে বের করা।'

'কাজটা কবে শেষ করতে হবে?'

'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। তবে আজ থেকে কাজটা শুরু হবে। যত দিনই লাগুক, এর জন্য আপনারা প্রতিদিন এক্সট্রা এক হাজার টাকা করে পাবেন।'

'না, ওই এক্সট্রা টাকা লাগবে না। আপনি আমাকে দুই লাখ টাকা দিতে চেয়েছেন, কিন্তু আমাকে দিতে হবে তিন লাখ টাকা।'

লিজা কোনো রকম চিন্তা বা দ্বিধা না করে বলল, 'ওকে, তিন লাখ। কোনো অগ্রিম লাগবে?'

'না। তবে দু-একটা জিনিস লাগবে আমাদের।'

ব্যাগ থেকে কাগজ আর কলম বের করে লিজা বলল, 'জিনিসগুলোর নাম লিখে দিন, রাতের মধ্যে পেয়ে যাবেন সবকিছু।'

পুরো দেড় ঘণ্টা ফাস্টফুডের দোকানে আড্ডা দেয়ার পর চলে গেল লিজা। টিংকু ফুটপাতে এসে দাঁড়িয়ে বলল, 'লিজার কাজটা করার আগে অন্য একটা কাজ করব আমরা।'

'কী কাজ?'

'বড় একটা কাজ, কঠিন একটা কাজ।'

হাঁটতে হাঁটতে নিউমার্কেটের দক্ষিণ পাশে এসে টিংকু সারিবাঁধা গাড়িগুলো দেখতে লাগল। চমৎকার সব গাড়ি। একটু ফাঁকে আলাদা একটা গাড়ি দেখে সেদিকে এগিয়ে গেল ও। চারপাশে এক পলক দেখে প্যান্টের পকেট থেকে চাবির একটা গোছা বের করে আলতোভাবে খুলে ফেলল গাড়ির দরজাটা। তারপর ইশারা করে গাড়িতে উঠতে বলল আমাকে।

গাড়িতে উঠে বসলাম আমি। গোছার আরেকটা চাবি দিয়ে গাড়িটা স্টার্ট দিল টিংকু। তারপর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ওই এলাকাটা ত্যাগ করলাম আমরা।

গাড়ি নিয়ে বেশ কিছুদূর আসার পর টিংকু বলল, 'আজ রাতে একটা

কনসার্ট আছে না, চল, তার দুটো টিকেট কাটি।'

'আমাদের জন্য?'

'না।'

'তাহলে?'

'একটা বিশেষ প্রয়োজনে কিনব টিকেট দুটো।'

টিকেট কিনেই একটা খামে ভরে টিংকু বলল, 'চল, কিছু খেয়ে নিই। তারপর জরুরি কিছু কাজ করতে হবে। দ্রুত করতে হবে।'

খাওয়া শেষ করে টিংকু গাড়ির কাছে এসে বলল, 'দেখ তো, গাড়িটা বেশ পুরোনো না?'

'হ্যাঁ, বেশ পুরোনো।'

'তবে গাড়িটা একসময় খুব দামি ছিল।'

'এখন বেশি দাম হবে না।'

টিংকু নিচের ঠোঁটটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে বলল, 'চুরি করা গাড়ি বিক্রি করাও কঠিন। অনেক সময় ধরা পড়ে যেতে হয়।'

'তাহলে?'

'চল, গাড়িটা ফেরত দিয়ে আসি।'

'ফেরত দিবি!'

'হ্যাঁ, ফেরত দেব।'

আমি আগের চেয়ে অবাক হয়ে বলি, 'ফেরত দিতে গিয়ে যদি ধরা পড়ে যাই!'

'না, ধরা পড়ব না।' টিংকু পকেট থেকে একটা কলম আর কাগজ বের করে আমাকে দিয়ে বলল, 'তার আগে একটা চিঠি লেখ।'

'চিঠি! কাকে?'

'গাড়ির মালিককে।'

টিংকু বলতে লাগল আর আমি লিখতে লাগলাম—

> জনাব, প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। খুব জরুরি একটা প্রয়োজনে এক জায়গায় যাওয়ার দরকার ছিল আমার। কিন্তু আপনি তো জানেন, খুব প্রয়োজনের সময় এই ঢাকা শহরে কোনো সিএনজি অটোরিকশা কিংবা কোনো ক্যাব পাওয়া যায় না। অগত্যা তাই আপনার গাড়িটা চুরি, মানে না-বলে নিতে হয়েছিল আমাকে। যে কয় লিটার তেল খরচ হয়েছে, এর চেয়ে বেশি ভরে দিয়েছি। গাড়িরও

কোনো ক্ষতি হয়নি। মাঝখান দিয়ে আমার অনেক উপকার হলো। কিন্তু আপনাদের যে বিড়ম্বনা হলো, সে জন্য সামান্য ক্ষতিপূরণ দিয়ে গেলাম। আপনার গাড়ির সামনের সিটে একটা খাম রেখে গেলাম। ওখানে আজকের একটা কনসার্টের টিকেট আছে। আশা রাখি আপনার স্ত্রীকে নিয়ে কনসার্টটা ভালোভাবে উপভোগ করবেন আপনি। আমারও ভালো লাগছে ঠিকমতো আপনার গাড়িটা ফেরত দিতে পারলাম বলে।'

চিঠিটা লেখা শেষ করেই আমি বললাম, 'গাড়িটা যথাস্থানে রেখে এলেই হয়, এত চিঠিমিঠি লেখার দরকার কী!'

'দরকার আছে।'

নিউমার্কেটের যে জায়গা থেকে গাড়িটা নিয়েছিলাম, আমরা তার কাছাকাছি গাড়িটা রেখে একটু ফাঁকে দাঁড়িয়ে রইলাম আমরা। কিছুক্ষণ পর কয়েকজন পুলিশসহ এক দম্পতি এসে দাঁড়াল গাড়ি রাখার আগের জায়গাটায়। উত্তেজনা নিয়ে তারা কথা বলতে বলতে গৃহকর্তাটি হঠাৎ এদিকে তাকান এবং কিছুটা চিৎকার করে এগিয়ে আসেন গাড়িটার দিকে। দ্রুত গাড়ির দরজা খুলে প্রথমেই চিঠিটা হাতে নেন। পড়া শেষে খামটা খুলে টিকেট দুটো বের করে হাসতে থাকেন তিনি।

সারা দিন আজ আমরা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরেছি। রাত আটটার দিকে শ্যামলীর দিকে এসে টিংকু বলল, 'কনসার্টটা যেন কখন আরম্ভ হওয়ার কথা?'

'টিকেটে তো আটটার কথা লেখা ছিল।'

'এখন কয়টা বাজে?'

'আটটার কাছাকাছি।'

'তাহলে যারা ওই কনসার্টের টিকেট কিনেছে কিংবা কোনোভাবে পেয়েছে, তারা এতক্ষণে কনসার্টটা দেখতে গেছে, না?'

'তা-ই তো যাওয়ার কথা।'

পকেট থেকে একটা নোটবুক বের করে টিংকু আমার হাতে দিয়ে বলল, 'গাড়ির ভেতর এই নোটবুকটা পেয়েছি। এখানে ওই মালিকের বাসার ঠিকানা আছে। দেখ তো, ওই সামনের বিল্ডিংটা না?'

নোটবুকটার দিকে তাকিয়ে আমি বললাম, 'হ্যাঁ, ওই বিল্ডিংটাই।'

টিংকু আমার হাত থেকে নোটবুকটা ফেরত নিয়ে পকেটে ঢোকাল আবার। তারপর আস্তে আস্তে বিল্ডিংটার সামনে গিয়ে দ্রুত নিজেকে পাল্টে ফেলে দারোয়ানকে কিছুটা ধমকের স্বরে বলল, 'পাভেল ভাই তো তিনতলার ডান দিকে থাকে, না?'

'জি।' দারোয়ানটি একটা টুলে বসে ছিল। উঠে দাঁড়িয়ে সে বলল, 'পাভেল স্যার আপনাদের কী হয়?'

'আমার চাচাতো ভাই, আর— ।' টিংকু আমাকে দেখিয়ে বলে, 'ওর আপন ভাই। আমরা তেজকুনীপাড়ায় থাকি।'

'বাসায় তো কেউ নাই।'

'হ্যাঁ ভাবি আর ভাই কনসার্ট দেখতে গেছে।'

'জি।'

'আমাদেরও কনসার্ট দেখার কথা ছিল, কিন্তু টিকেট পাওয়া যায়নি বলে ফেরত এসেছি আমরা। তাই— ।' পকেট থেকে গাড়ির তালা খোলার সেই চাবির গোছাটা বের করে টিংকু বলল, 'পাভেল ভাই তাই চাবিটা দিয়ে বললেন, তোরা আমাদের বাসায় যা, আমরা কনসার্ট দেখে ফিরে এসে একসঙ্গে খাব।'

'যান।' দারোয়ানটি সিঁড়ি দেখিয়ে দিয়ে বলল।

তিনতলায় উঠে ডান পাশের দরজাটায় চাবি ঢুকিয়ে দিল টিংকু। দরজা খুলল না। এরপর অন্য একটা চাবি ঢুকিয়ে দিল, এটাতেও খুলল না। বুকের ভেতর ধুকধুক শুরু হয়ে গেল আমার, একটু একটু ঘামতেও লাগলাম আমি। কিন্তু টিংকু নির্বিকার। চাবির গোছাটা হাতে নিয়ে একটা একটা করে চাবি বাছতে লাগল ও। শেষে একটা চাবি বেছে দরজায় ঢুকিয়ে কায়দা করে একটু চাপ দিল। সঙ্গে সঙ্গে খটাস করে খুলে গেল দরজাটা।

ঘরের ভেতর ঢুকলাম আমরা। অন্ধকার ঘর। দেয়াল হাতড়িয়ে সুইচ বের করে লাইট জ্বালিয়ে আমরা বেডরুমে চলে গেলাম দ্রুত। তারপর আলমারিটা খুলে সবগুলো কাপড় আর জিনিসপত্র এলোমেলো করে খুঁজে যা পেলাম, তা হলো—চারটা এক শ টাকার বান্ডিল, মানে চল্লিশ হাজার টাকা; আর সোনার গয়নাভর্তি বড় বড় দুটি লাল রঙের বক্স। সেগুলো শক্ত একটা কাগজের

ব্যাগের ভেতর ভরল টিংকু। তারপর আমাকে বলল, 'আরেকটা চিঠি লেখ।'

পকেট থেকে কাগজ আর কলম বের করলাম আমি। তারপর টিংকু বলতে লাগল আর আমি লিখতে লাগলাম—

> প্রয়োজন ছিল বলে গাড়িটা নিয়েছিলাম এবং ফেরতও দিয়েছিলাম। প্রয়োজন ছিল বলে আপনার আলমারি থেকে চল্লিশ হাজার টাকা আর গয়নাভর্তি বক্স দুটোও নিয়ে গেলাম। তবে এগুলো ফেরত দিতে পারব কি না আল্লাহ্ জানে! ভালো কথা, আশা রাখি, যে টিকেট দুটো দিয়েছিলাম, তা দিয়ে আজ রাতের কনসার্টটা বেশ ভালোই উপভোগ করেছেন।

চিঠিটা বেডরুমের বিছানার ওপর রেখে লাইটটা অফ করে বাসা থেকে বের হয়ে এলাম আমরা। এর আগে ফ্রিজ থেকে দুটো আপেল আর দুটো কমলা নিয়ে নিল টিংকু।

বেশ রাত করে আজ বাসায় ফিরেছি আমরা। সোনার জিনিসগুলো বিক্রি করতে অনেক কষ্ট হয়েছে। যে জুয়েলার্সেই যাই তারাই সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকায় আমাদের দিকে। দামও বলে বাজারের দামের চেয়ে বেশ কম। এক জুয়েলার্সের মালিক কিছুটা দ্বিধা নিয়ে বলে, 'আচ্ছা, এই সোনাগুলো আপনাদের নিজেদের?'

টিংকু একটু রেগে গিয়ে বলল, 'কেন, আপনার কী মনে হয়?'

জুয়েলার্সের মালিক কিছুটা বিব্রত হয়ে বলে, 'না না, আমার কিছু মনে হয় না।'

'তাহলে জিজ্ঞেস করলেন যে?'

'এমনি আর-কি।'

'তাই?' টিংকু দাঁতমুখ শক্ত করে গম্ভীর গলায় বলে, 'ছোট্ট করে একটা গল্প বলি আপনাকে। প্রতিদিন সকালে এক ধর্মপ্রাণ লোক এক পুকুরে ওজু করে নামাজ পড়েন। এক চোরও প্রতিদিন চুরি করে এসে ওই পুকুরে গোসল করে। একদিন ধর্মপ্রাণ মানুষটা দেখেন, চোরটা পুকুরে এসে গোসল করছে। কিন্তু তিনি তো জানেন না ওই লোকটা চোর। তিনি ভাবেন, আহা, ওই লোকটা আরো কত বেশি ধর্মপ্রাণ, তার চেয়েও আগে এসে পুকুরে ওজু করছে! কিছুক্ষণ পর ওই চোরটাও ধর্মপ্রাণ মানুষটাকে দেখে। সেও জানে না এই লোকটা ধর্মপ্রাণ। চোরটা ভাবে, ইস্, ওই লোকটা আমার চেয়েও কত পাকা চোর! আমার আগেই চুরি সেরে এসে গোসল করছে।' টিংকু জুয়েলার্সের মালিকের চোখের দিকে তাকিয়ে বলে, 'কী বুঝলেন?'

ওই জুয়েলার্স থেকে বের হয়ে আসি আমরা। অনেক ঘোরাঘুরির পর বড় একটা জুয়েলার্সে সবগুলো সোনা বিক্রি করে ফেলি।

বাসায় ঢোকার আগেই টিংকু বলল, 'চল, আগে বাড়িওয়ালার সঙ্গে দেখা

করে আসি।'

'কেন?'

'আমাকে সেদিন যেতে বললেন না! এ ছাড়া টাকাগুলোও রেখে আসা দরকার।'

'রাত করে এত টাকা নিয়ে গেলে সন্দেহ করতে পারেন তিনি।'

'না, সন্দেহ করবেন না। সে সুযোগ দেবই না তাকে।'

বাড়িওয়ালা খবিউর মোল্লার বাসাটা ঠিক এই মেসবাড়ির পেছনেই। বাসার সামনে এসে কলবেল টিপতেই একটা মেয়ে এসে দরজাটা খুলে দেয়। টিংকু হাসি হাসি মুখ করে বলে, 'স্যার আছেন?'

'ছার!' মেয়েটা কেমন চমকে যায়।

'জি, স্যার।'

'এখানে তো ছার-টার থাকে না।'

'এটা খবিউর মোল্লার বাসা না?'

'জি।'

'আমরা ওনার কাছেই এসেছি। আমরা ওনাকে স্যার ডাকি।'

'ছার ডাকেন কেন? বাবা কি আপনাদের পড়ায়?' সামান্য হেসে মেয়েটি বলে, 'বাবা পড়াবে কীভাবে, বাবা তো লেখাপড়াই জানে না।'

'আমরা ওনাকে সম্মান করে স্যার ডাকি।'

'অ। কিন্তু বাবা তো ঘুমায়।'

'এত তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়েছেন?'

'বাবার শরীরটা ভালো না।'

'ঠিক আছে, আপনি শুধু স্যারকে বলুন, টিংকু এসেছে। ব্যস, আর কিছু করতে হবে না আপনাকে।'

'শুধু টিংকু বললেই হবে?'

'হ্যাঁ, টিংকু বললেই হবে।'

মেয়েটা দরজা বন্ধ করে ভেতরে চলে গেল। একটু পর দরজা খুলে বাড়িওয়ালা বললেন, 'টিংকু, তুমি! তুমি আসবে জানলে তো ঘুমাইতামই না। আসো আসো, ভিতরে আসো।'

জুতা পায়েই আমি ভেতরে ঢুকতে যাচ্ছিলাম, এর আগেই টিংকু আমার হাতে টেনে ধরে ইশারা করে জুতা খুলতে বলে আমাকে, সেও খুলতে থাকে জুতাটা। তা দেখে বাড়িওয়ালা বলেন, 'না না, জুতা খুলতে হইব না। জুতা

পায়ে দিয়া আসো।'

টিংকু জুতা খোলা শেষ করে বলে, 'তা ঠিক হবে না স্যার। আপনার বাসায় ঢুকব, তাও আবার জুতা পায়ে দিয়ে, ব্যাপারটা কেমন অসম্মানের হয়ে যায় না!'

'তুমি যে কী কও না টিংকু!'

ঘরের ভেতর ঢুকেই টিংকু বলে, 'আপনারা শরীর নাকি অসুস্থ স্যার? শুনে তো চিন্তায় আমি অস্থির। আপনি এখনই অসুস্থ হলে চলবে কীভাবে? আপনাকে নিয়ে আমাদের কত আশা! আমরা ভেবেছি এ এলাকার এমপি পদে দাঁড় করিয়ে দেব আপনাকে। দেশে তো আপনার মতোই শিক্ষিত লোক দরকার। আপনার মতো যোগ্য লোক এ এলাকায় কয়টা আছে?'

'তুমি দেখি আমার মনের কথাটাই কইছ টিংকু।'

'আমি আপনার মনের কথা বুঝতে পারি তো।' টিংকু দু হাত একসঙ্গে করে কিছুটা কচলানোর ভঙ্গিতে বলে, 'আমি আপনার মনের কথা বুঝব না তো কে বুঝবে?'

'তা তো বটেই।' খবিউর মোল্লা মুখে জমে ওঠা পানের রসটুকু শুষে নিয়ে বলেন, 'তা কী খাবা, কও?'

'কিছু খেতে হবে না স্যার।'

'এইটা কী বললা তুমি! তোমরা এই প্রথম আমার বাসায় আসলা, না খায়া যাইবা নাকি?'

'না, সারা দিন পরিশ্রম করে বাসায় ফিরলাম তো। ভেবেছি গোসল-টোসল সেরে তারপর মুখে কিছু দেব।' টিংকুর হাত দুটো একসঙ্গেই আছে।

'অ, আচ্ছা। তা কী মনে কইরা বাসায় আসলা? কিছু কইবা নাকি আমাকে?' খবিউর মোল্লা একটু ঝুঁকে বসেন টিংকুর দিকে।

'জি, আপনি তো আমাদের আশ্রয়, আমাদের ব্যাংক। কিছু টাকা নিয়ে এসেছিলাম আপনার কাছে রাখার জন্য।'

'কত টাকা?'

'দুই লাখ টাকার মতো।'

'কত!'

'স্যার, দুই লাখ টাকা।'

'এত টাকা পাইলা কোথায় তোমরা?'

'স্যার, আমরা ছোটখাটো বিজনেস করি।'

'ছোটখাটো বিজনেস মানে কিসের বিজনেস?'

'শেয়ারবাজারের বিজনেস।'

'অ, শুনছি ওই বিজনেসে নাকি অনেক লাভ। দিনে কয়েক লাখ টাকাও কামানো যায়। কিন্তু আমি ওই ব্যবসাটা বুঝি না।'

'খুব সহজ ব্যবসা স্যার। আপনার শুধু টাকা থাকলেই চলবে।'

'টাকা আমার আছে। আল্লাহর রহমতে টাকার কোনো অভাব নাই আমার। কত টাকা লাগে ওই ব্যবসা করতে?'

'যে যত টাকা খাটাবে, সে তত বেশি লাভ করবে।'

'আমি তো তেমন সময় দিতে পারুম না। তা টাকাটা যদি আমি তোমাদের দেই, তোমরা ব্যবসা করতে পারবা তো? লাভ যা হল আমি কিছু নিলাম, তোমরা কিছু নিলা।'

'আশা রাখি অসুবিধা হবে না স্যার। আপনি আমাদের বিশ্বাস করে টাকাটা দেবেন, আমরা জানপ্রাণ দিয়ে হলেও সেই বিশ্বাস অক্ষুণ্ন রাখব স্যার।' টিংকু ওর শরীরটা বেশ শক্ত করে কথাটা বলে। তারপর পকেট থেকে টাকাগুলো বের করে খবিউর মোল্লার হাতে দেয় ও। আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর বাসা থেকে বের হয়ে আসি আমরা।

বাসা থেকে বের হওয়ার পর থেকেই টিংকু হাসতে থাকে। আমি কিছুটা বিরক্ত হয়ে বলি, 'হাসছিস কেন?'

'হাসি আসছে তাই হাসছি।'

'অযথা কেন হাসি আসছে তোর!'

'অযথা হাসি আসছে!' টিংকু হাঁটা বাদ দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলে, 'অযথা হাসি আসছে না। হাসি আসছে আনন্দে, মহা আনন্দে।' সিনেমার ভিলেনের মতো শব্দ করে হাসতে থাকে টিংকু।

আমাদের মেসবাড়ির দিকে এগিয়ে যেতেই থমকে দাঁড়াই আমরা। একটা সাদা গাড়ি থেমে আছে সেখানে। আমরা আবার হাঁটতে থাকি সেদিকে। এগিয়ে যাই গাড়িটার দিকে। তার আগেই লিজা বের হয়ে আসে গাড়ি থেকে। টিংকু কিছুটা অবাক হয়ে বলে, 'আপনি! রাত করে!'

'আমার কাজটা করার জন্য কিছু জিনিস চেয়েছিলেন আপনি। জিনিসগুলো নিয়ে এসেছি আমি।'

'কাল সকালে দিলেই চলত।'

'কিন্তু আমি আজ রাতেই দিতে চেয়েছি।' লিজা একটু থেমে বলে,

'আপনি বোধহয় বুঝতে পারছেন, কাজটা শেষ করার জন্য আমি কতটা উদগ্রীব, কাজটা যত দ্রুত সম্ভব শেষ করতে চাই আমি। আর এই নিন ঠিকানাটা, এই কাগজেই কিছু ইনফরমেশন আছে, কাজে লাগতে পারে আপনার।'

'আপনার কাজ হয়ে যাবে। কাল থেকেই আমি শুরু করব। দেখি, কত দ্রুত শেষ করতে পারি কাজটা।'

'থ্যাংক ইউ।' লিজা গাড়ির ভেতর থেকে বড় একটা প্যাকেট বের করে আমাদের দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বলে, 'আপনাদের জন্য।'

'এগুলো কী?'

'কিছু খাবার আছে। খুব চমৎকার একটা জায়গায় ডিনার করছিলাম আমরা। আমরা মানে আমি, বাবা, মা আর আমার বড় বোন। খেতে খেতে আপনাদের কথা মনে হচ্ছিল, তাই খাবারগুলো নিয়ে এলাম।'

'কিন্তু প্যাকেট দেখে তো মনে হচ্ছে কয়েকজনের খাবার এনেছেন আপনি!' টিংকু প্যাকেটটা হাতে নিয়ে বলে।'

'কয়েকজন মিলেই খাবেন।'

'থ্যাংক ইউ।'

লিজা মাথাটা নিচু করে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর মাথাটা উঁচু করে বলে, 'আপনারা কাজটা করতে পারবেন তো?'

টিংকু হাসতে হাসতে বলে, 'আপনার কী মনে হয়?'

'আমার মাথায় ঠিক কিছু আসছে না।'

'বিশ্বাস রাখুন, আপনার কাজটা হয়ে যাবে।'

'থ্যাংক ইউ।' বলেই লিজা মুখটা আকাশের দিকে উঁচু করে। আকাশে চাঁদ উঠেছে। সেই চাঁদের আলোয় দেখতে পাই, লিজার চোখ দুটো ভিজে উঠেছে, মুক্তার দানার চকচক করছে চোখের কোণ দুটো।

খুলে গেল দরজাটা, পরিমাণমতো। আমার দিকে এক পলক তাকিয়ে কিছুটা অবজ্ঞার স্বরে লিজা বলল, 'কী চাই?'

'আমাদের একটা ট্রাউজার হঠাৎ উড়তে শিখেছে।'

'ট্রাউজার উড়তে শিখেছে!'

'পিপীলিকার পাখা গজায় মরিবার তরে, আর আমাদের ট্রাউজারটার পাখা গজিয়েছে আপনাদের রান্নাঘরের জানালার পাশে ঝুলিবার তরে।'

'ট্রাউজারের আবার পাখা গজায় নাকি!'

'সব ট্রাউজারের জন্মায় না, কিছু কিছু ট্রাউজারের জন্মায়।' লিজার চোখের দিকে তাকিয়ে বলি, 'নতুন পাখা গজিয়েছে তো, আবার অন্য কোথাও উড়ে যেতে পারে। তার আগে কি আমি ওটাকে নিয়ে যেতে পারি?'

দ্বিধাগ্রস্ত চেহারায় সরে দাঁড়াল লিজা। ঘরের ভেতর ঢুকলাম আমি। দরজাটা বন্ধ করে হাত দিয়ে ইশারা করল লিজা রান্নাঘরের দিকে। পা বাড়ালাম ওদিকে। জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে ট্রাউজারটা নিয়ে চলে আসতেই দেয়ালে টাঙ্গানো একটা ছবির দিকে চোখ গেল আমার। পাটের চটের ওপর সুন্দর নকশা করা একটা ছবি।

লিজা আর এদিকে এগিয়ে আসেনি, বাইরের দরজার কাছেই মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে। কিছুটা দ্বিধা, কিছুটা ভয়, কিছুটা আতঙ্ক, কিছুটা অবিশ্বাস—সব মিলিয়ে সে তটস্থ। ওর সামনে গিয়ে আমি বললাম, 'দেয়ালে টাঙ্গানো চটের ওপর ওই ছবিটা কে করেছে?'

'কেন?'

'আমার মা ওরকমভাবে ছবি করতেন।' আল্লাহর কসম লাগে, আমার মা জীবনেও ওরকম ছবি করেননি, বাকি যে কয়টা বছর বেঁচে থাকবেন, করার কোনো সম্ভাবনা নেই। মুখটা হাসি হাসি করে আমি বললাম, 'মা বলেন, যারা এরকম নিপুণ হাতে কাজ করতে পারে, তারা নাকি জীবনে অনেক সুখী হয়।'

'ছবি করার সঙ্গে সুখী হওয়ার সম্পর্ক কোথায়?'

'আমি সেটা জানি না, সম্ভবত মা জানেন।' হঠাৎ চোখ যায় ওপাশের বারান্দার দিকে। একটা ময়না পাখি ঝুলানো আছে খাঁচায়। আমি অবাক হওয়ার ভান করে বলি, 'বাহ্, পাখিটা তো খুব সুন্দর! কোন ক্লাসে পড়ে ও?'

'কোন ক্লাসে পড়ে মানে!' কিছুটা বিরক্তি নিয়ে বলে লিজা।

'ওটা ময়না তো?'

'হ্যাঁ, ময়না।'

'ময়না তো কথা বলতে পারে। এটা কথা বলা শিখেছে?'

'শিখেছে।'

'তাহলে তো আসল কাজটাই হয়ে গেছে। এবার ওকে অ আ শিখান, তারপর একদিন কোনো মেডিকেল কলেজ কিংবা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি করিয়ে দেবেন। তারপর দেখবেন আপনার ওই ময়নাসহ আপনার ছবি সারা পৃথিবীর সব পত্রিকায় ছাপা হবে।'

ফিক করে হেসে ফেলে লিজা। হেসে ফেলে আমার বুকের ভেতরটাও। টেলিভিশনে দেখা চায়ের একটা বিজ্ঞাপন দেখে হঠাৎ মাথায় এসে যায় আইডিয়াটা। লিজা হাসতে হাসতে বলে, 'আপনি খুব দুষ্টু, না?'

'আপনার তাই মনে হয়?'

লিজা চোখ দুটো মেলে ভালো করে তাকিয়ে বলে, 'চা খাবেন?'

'খাব। তিন চামচ চিনি, দুধ ছাড়া। তবে চায়ের রংটা হবে আপনার কালার করা চুলের মতো।'

নির্দ্বিধায় বলতে পারি—আমি আনন্ত, পিতা : মিনহাজ আহমেদ চৌধুরী, গ্রাম : রহমতগঞ্জ, জেলা : সিরাজগঞ্জ, প্রাথমিকভাবে সফল। এখন খুব ধীরে-সুস্থে, বুদ্ধি করে এগিয়ে যেতে হবে আমাকে। কৌশলও করতে হবে একটু।

দুটো মিষ্টি আর এক কাপ চা এনে লিজা বলল, 'এখনো দাঁড়িয়ে আছেন আপনি, বসুন।'

একটা সোফায় বসতে বসতে আমি বললাম, 'আপনি খাবেন না?'

'একটু আগেই খেয়েছি।'

'চা খুব স্বাদের হয়েছে—এটা কি করে বোঝা যায় জানেন?'

'কী করে?'

'যখন দেখবেন—চায়ে একটা মাছি মরে ভেসে আছে। মাছিটা কেন মরে যায়, জানেন? স্বাদের চা খেতে খেতে পেটটা ফেটে মারা যায়।'

লিজা আমার সামনে চায়ের কাপটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার বানানো চা তো বোধহয় তাহলে খুব বেশি স্বাদের হয়নি, কোনো মাছি তো মরে ভেসে নেই। আচ্ছা—।' লিজা সিরিয়াস ভঙ্গিতে বলে, 'আপনারা যে চা বানান তাতে মাছি মরে ভেসে থাকে?'

'অবশ্যই।'

'আপনারা তখন কী করেন?'

'চায়ের কাপ থেকে মাছিটা তুলে এমনভাবে ঠোঁটে নিয়ে চুষি, মাছির পেটে থাকা সব চা আমাদের পেটে চলে আসে। যা স্বাদ লাগে না!'

বাইরে এসেই থমকে দাঁড়াই আমরা। মফিজ আর জলিল বসে আছে বারান্দায়। ফিসফিস করে কী যেন বলছিল ওরা, আমাদের দেখেই থেমে যায়। টিংকু এগিয়ে গিয়ে বলে, 'কী হয়েছে?'

জলিল হুহ্ শব্দ করে বলে, 'তোমার জন্যই তো— ।'

কথাটা শেষ করতে পারে না জলিল। তার আগেই মফিজ তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে, 'প্রেসার আছে তো। ভোররাতের দিকে প্রেসারটা বাইড়া গেছিল। ওরে ডাইকা মাথায় পানি দেওয়াইলাম, ঘাড়টা একটু মেসেজ করাইলাম। এখন একটু ভালো লাগতেছে।'

'প্রেসারটা হঠাৎ বেড়ে গেল কেন আপনার?'

'সুখে রে ভাই, সুখে।'

'আপনি কি কোনো কারণে আমার ওপর খেপে আছেন মফিজ সাহেব?' মফিজের আরো একটু সামনে দাঁড়িয়ে টিংকু বলে।

'না রে, ভাই। আমার চারপাশেই সব জঙ্গল দিয়া ভরা। খেপলে তো এই জঙ্গলের ওপর আগে খেপতে হয়।'

'বুঝলাম না।'

'আমিও বুঝি না।' মফিজ একটু খেপে যাওয়ার মতো করে বলে, 'আপনি এখন যান, আপনার সঙ্গে কথা বলতে ভালো লাগতেছে না।'

'পরে আরো ভালো লাগবে না।'

'কী কইলেন?'

'শুনতে পাননি কী বলেছি?'

'আপনি খুব বাড়াবাড়ি করতেছেন টিংকু সাহেব। বেশি বাড়াবাড়ি ভালো না।' মফিজ বারান্দা থেকে উঠে দাঁড়ায়।

'আমি জানি, কিন্তু আপনি জানেন না সেটা।' টিংকু মুচকি হাসতে হাসতে বলে।

'আমি জানি না মানে?'

'হ্যাঁ, আপনি জানেন না। আর জানেন না বলেই আপনি বাজার করতে গিয়ে খাঁটি বাংলায় বলতে হয়—চুরি করেন।'

'প্রমাণ আছে আপনার কাছে?'

'আছে।' টিংকু মফিজের চোখের দিকে তাকিয়ে বলে, 'এই অল্প দিনের জীবনে এত কিছু দেখেছি, সবকিছু এখন এমনি এমনি বুঝতে পারি। শুনুন মফিজ সাহেব, আপনি আরো দুটো অন্যায় কাজ করেন, অসম্ভব ধরনের

অন্যায়, বাজে ধরনের অন্যায়।'

'কী! কী অন্যায় কাজ করি আমি?'

'বলব, সময় হলেই বলব। তখন আর কোনো কিছু করে কূল পাবেন না। পালাতে হবে তখন আপনাকে।'

টিংকু আর কিছু বলে না। চলে আসে মফিজের সামনে থেকে। বাইরে না গিয়ে ও ঘরের ভেতর ঢুকতে নিতেই আমি বলি, 'বাইরে যাবি না?'

'না, এখন আর বাইরে যেতে ইচ্ছে করছে না।'

'মন খারাপ হয়ে গেছে তোর?'

'না, ঠিক মন খারাপ না। মনে হচ্ছে কোথাও ছুটে চলে যাই। তারপর চিৎকার করে কাঁদি, আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে দিয়ে কাঁদি। এত চাপ আর ভালো লাগে না।' টিংকু মন খারাপ করে বিছানায় শুয়ে পড়ে।

খাদেম ছেলেটা শব্দ করে পড়ছে। বেশ ভালো লাগছে আমার। বদিউল ভাই হঠাৎ দৌড়ে এসে বললেন, 'টিংকু ভাই, ঘুমিয়েছেন নাকি?'

টিংকু উঠে বসে বলল, 'না। কী খবর বদিউল ভাই?'

'জলিল তো রান্নাবান্না বন্ধ করে দিয়েছে।'

'কেন?'

'তা তো জানি না।'

'আপনি কিছু জিজ্ঞেস করেননি?'

'করেছিলাম।'

'কী বলেছে ও।'

'ওর নাকি রান্না করতে ইচ্ছে করছে না। আগামী তিন দিন নাকি ও রান্না করবে না।' বদিউল ভাই বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে বলেন।

টিংকু বিছানা থেকে নেমে বাইরে যাওয়ার জন্য পা বাড়ায়। তার আগেই বদিউল ভাই বলেন, 'আর একটা কথা।'

ঘুরে দাঁড়ায় টিংকু, 'বলুন।'

'মফিজ সাহেব কিন্তু এ সপ্তাহের খাওয়ার টাকা দেয় নাই।'

'কেন?'

'তিনি নাকি আর আমাদের সঙ্গে খাবেন না।'

'জলিল টাকা দিয়েছে?'

'জলিলকে তো খাওয়ার টাকা দিতে হয় না, বরং আমরাই ওকে দিই। মাস শেষে সবাই মিলে ওকে কিছু টাকা দিই আমরা।'

'আসুন আমার সঙ্গে।'

রান্নাঘরে এসে দেখি, জলিল হাত-পা ছড়িয়ে বসে আছে। খুব উদাস হয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে গুনগুন করে কী একটা গানও গাইছে। আমাদের দেখে গানটা থামিয়ে দিল, কিন্তু বাইরের দিকে তাকিয়ে উদাস হয়ে বসে রইল আগের মতোই। টিংকু ওর সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'জলিল, আমার দিকে তাকাও।'

'তুমি আমার কে যে তোমার দিকে তাকাতে হইব! না, কারো দিকে তাকানোর কোনো সময় নাই আমার।'

'ঠিক আছে, তাকাতে হবে না। এবার বলো, তুমি রান্না করবে না কেন?' টিংকু ওর সামনে বসে কথাটা বলে।

'ভালো লাগতেছে না আমার।'

'কেন ভালো লাগছে না?'

'জানি না।'

'তুমি রান্না করবে না, এতে সবাই না-খেয়ে থাকবে, তারা কষ্ট পাবে এতে, তোমার ভালো লাগবে?'

'জানি না।'

'আমি শুনেছি তুমি খুব ভালো একটা মানুষ। মনোযোগ দিয়ে রান্না করো তুমি, রান্না করার সময় তুমি কখনো এটা-সেটা মুখে দাও না। রান্না শেষে সবাইকে সমান যত্ন করে খাবার বেড়ে দাও। তোমাকেও সবাই পছন্দ করে, পছন্দ করে কি, খুব পছন্দ করে। তোমার কোনো অসুবিধা থাকলে তুমি বলো। তুমি আমাদের বলবে না তো কাদের বলবে। কারণ তোমার অসুবিধা তো আমাদেরই অসুবিধা। ঠিক কি না?'

জলিল কোনো কথা বলে না। বসে থাকে আগের মতোই।

'তোমার সঙ্গে জরুরি একটা কথাও আছে আমার। কথাটা শুনে তোমার ভালো লাগবে। তুমি সময় করে আমার কাছে একবার এসো।'

রান্নাঘর থেকে ফিরে আসার বিশ-পঁচিশ মিনিটের মধ্যে জলিল এসে হাজির। দু হাতে দুটো খাবারের প্লেট, মুখ কিছুটা গম্ভীর।

টিংকু হেসে হেসে বলল, 'জলিল, তুমি যে খুব ভালো একটা মানুষ, এটা আবার প্রমাণ হয়ে গেল। বসো। তোমাকে জরুরি কথাটা বলি। তার আগে একটা কাজ করবে তুমি—।' পকেট থেকে পাঁচ শ টাকার একটা নোট বের করে জলিলের হাতে দিয়ে টিংকু বলে, 'এই টাকাটা দিয়ে ভালো একটা শার্ট

কিনবে তুমি। তারপর সেই শার্ট গায়ে দিয়ে আমার সামনে আসবে, তখন আমি তোমাকে জরুরি কথাটা বলব। ভালো কোনো জরুরি কথা শুনতে হলে ভালো কোনো পোশাক পরে আসতে হয়।'

মুখটা হাসি হাসি করে টাকাটা নিয়ে জলিল চলে গেল। আমি টিংকুর দিকে তাকিয়ে বললাম, 'আসলেই জরুরি কোনো কথা আছে নাকি?'

মাথা এদিক-ওদিক করে টিংকু বলল, 'না।'

টিংকুকে মাঝে মাঝে আমি একদম বুঝতে পারি না। ও এত উগ্রভাবে চলে, কিন্তু ওর মনটা অসম্ভব নরম! ওর সঙ্গে না মিশলে বোঝা যাবে না ও কত সরল! আমরা যে জায়গাটায় এর আগে কাজ করতাম, সেখানে প্রায়ই নিগ্রো শ্রেণীর কিছু মানুষ আসত সাহায্যের জন্য। আমি দেখেছি, টিংকু না খেয়ে ওর খাবারগুলো দিয়ে দিত ওদের।

খাবার খেতে খেতে আমার দিকে তাকিয়ে টিংকু বলল, 'লিজা মেয়েটাকে তোর কেমন মনে হয়?'

'রহস্যময়ী।'

'আমারও। কী একটা কাজের জন্য তিন লাখ টাকা দেবে আমাদের। যদিও কাজটা একটু জটিল। আচ্ছা বল তো, কাজটা আসলেই আমরা করতে পারব?' টিংকু আমার দিকে তাকায়, আমিও ওর দিকে তাকাই। প্রশ্নটার জবাব দিতে হয় না আমাকে। ওর চোখই বলে দেয়, ও পারবে।

লিজার দেওয়া ঠিকানা অনুযায়ী বাসাটার সামনে এসে টিংকু হাসতে হাসতে আমাকে বলল, 'বল তো, বাসাটা বানাতে কত টাকা খরচ হয়েছে?'

'বলতে পারব না।'

'এটা বল তো, এ বাসাটা বানাতে যত টাকা খরচ হয়েছে, সবগুলো টাকাকে যদি এক টাকার কয়েন করা হয়, সেই সব কয়েনের ওজন বেশি হবে, না বাসাটার ওজন বেশি হবে?'

'এটাও বলতে পারব না।'

'এটাও বলতে পারবি না?' টিংকু একটু থেমে বলে, 'আমাদের মতো এ রকম নিম্নমধ্যবিত্ত একজন মানুষ যদি দিনে পাঁচ শ টাকা ইনকাম করে, সংসারে কোনো খরচ না করেই ওই পাঁচ শ টাকা জমায়, তাহলে কত বছর পর এ রকম একটা বাসা বানাতে পারবে সে?'

'এসব কী প্রশ্ন করছিস তুই!'

'বাসাটা দেখেই প্রশ্নগুলো মাথায় এলো তো, তাই তোকে জিজ্ঞেস করলাম।' টিংকু বাসাটার ওপরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ভালো করে দেখ, চোখ দুটোকে সার্থক কর।'

বাসাটার দিকে তাকালাম আমি। মুগ্ধ করা বাসা। যেখানে যা প্রয়োজন, ঠিক তা-ই আছে সেখানে। কোথাও কোনো কিছুর কমতি নেই। একেবার নিখুঁত একটা ডিজাইন, রঙও করেছে অদ্ভুত ম্যাচ করে। চোখ ফেরানো যায় না বাসাটা থেকে।

দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে টিংকু বলল, 'চল, কাজটা শুরু করি। কালকে শেষ করতে পারলেই ভালো হয়।'

বাসাটার গেটের কাছে যেতেই খাকি প্যান্ট-শার্ট পরা দারোয়ানটা এগিয়ে এলো। তারপর কিছুটা কর্কশ গলায় বলল, 'কাকে চান আপনারা?'

টিংকু প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বলল, 'আস্‌সালামু আলাইকুম।'

দারোয়ানটা কিছুটা বিব্রতকর অবস্থায় পড়ল। আমাদের মতো মানুষেরা যে তাকে সালাম দিতে পারে, বিশ্বাস হচ্ছিল না তার এটা। টিংকু আরো একটু এগিয়ে গিয়ে বলল, 'ভাইজান, এই বাড়ির মালিক কি আপনি?'

'এটা কী বললেন! আমি এ বাড়ির দারোয়ান।'

'দারোয়ান, না?' টিংকু চোখ দুটো রাগী রাগী করে বলল, 'দারোয়ান হয়েছ দারোয়ানের মতো কথা বলো, ওরকম মেজাজ নিয়ে কথা বললে তো মনে হয় তুমিই এ বাসার মালিক! ওভাবে আর কথা বোলো না, ওভাবে কথা বললে মাথা গরম হয়ে যায় আমার। আর যখন মাথা গরম হয়ে যায়, তখন মনে যা আসে তা-ই করি। এবার বাসার ভেতর যান, তারপর রিদওয়ান সাহেবকে গিয়ে বলুন, রনি আর সাজু নামে দুজন লোক দেখা করতে এসেছে তার কাছে।'

'কোথা থেকে এসেছেন আপনারা?'

'সেটা বলতে হবে না। আমাদের কথা বললেই হবে।'

'না, হবে না। ছোটসাহেবের কাছে যে-ই আসুক, আগে বলতে হয় কোথা থেকে এসেছে।'

'তাই?' টিংকু নিচের ঠোঁট দুটো কামড়ে ধরে বলে, 'বলো, হিটলারের দেশ জার্মানি থেকে এসেছে।'

'জার্মানি থেকে?' দারোয়ানটি গেটটা বন্ধ করে একটু এগিয়ে গিয়ে আবার

ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে, 'আপনাদের নাম জানি কী?'

'রনি আর সাজু।'

তিন মিনিট পর দারোয়ান ফিরে এসে বলে, 'ছোটসাহেব বলেছেন, আপনারা কেন আসছেন?'

'বলো, সেটা তাকেই বলব। তবে এটা বলতে পার, জরুরি একটা কাজে এসেছি আমরা।'

দারোয়ান আবার চলে গেল। কিছুক্ষণ পর একজনকে সঙ্গে করে নিয়ে এলো সে। দেখেই বোঝা গেল, ইনিই রিদওয়ান খান। গেটের একটু ফাঁকে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, 'আপনারা?'

'জি, আমি রনি—।' টিংকু আমাকে দেখিয়ে বলল, 'আর ও হচ্ছে সাজু। আপনি যদি রিদওয়ান খান সাহেব হন, আমরা তাহলে আপনার কাছেই এসেছি।'

'জি, আমি রিদওয়ান। বলুন কেন এসেছেন?'

'এখানেই দাঁড়িয়ে বলব!' টিংকু হেসে হসে বলে, 'আপনার মনে যদি কোনো সাসপেক্ট কাজ করে তাহলে আমরা বাসার ভেতর ঢোকার পর আপনি আপনাদের সবগুলো গেটে তালা লাগিয়ে দিতে পারেন, যাতে কোনো অঘটন ঘটিয়েও পালাতে না পারি আমরা।'

'না না, ওরকম কিছু না। আপনারা আসুন।'

দারোয়ান গেটটা খুলে দিল, আমরা ভেতরে ঢুকলাম। ড্রয়িং রুমের সামনে এসে আপনা-আপনি আমাদের হাতটা জুতার দিকে গেল। জুতা নিয়ে ওই কার্পেটের ওপর ওঠা তো দূরের কথা, খালিপায়েই ওই কার্পেট ছোঁয়া রীতিমতো অন্যায় হবে। সোফাগুলো এত বড়, আমাদের মতো দুজন মানুষ একসঙ্গে বেশ আরাম করে বসতে পারবে একটাতে।

রিদওয়ান খান একটা সোফায় বসে আমাদেরও বসতে বললেন। তারপর কিছুটা আয়েশ করে হেলান দিয়ে বললেন, 'এবার বলুন, কী জন্য এসেছেন আপনারা।'

টিংকু সোজা হয়ে বসে আছে সোফায়। ও ওই অবস্থাতেই বলল, 'আপনি ইলিশ মাছ খেতে খুব পছন্দ করেন।'

'জি।' ছোট্ট করে উত্তর দেয় রিদওয়ান খান।

'মাংস আপনি একদমই পছন্দ করেন না, তবে মাঝে মাঝে কবুতরের মাংস খেতে আপনি ভালোবাসেন।'

'জি।'

'আপনার জন্মতারিখ হচ্ছে ১১ মে, ১৯৮৪। আপনি হচ্ছেন বৃষ রাশির জাতক।'

'আচ্ছা, এসব আপনি জানলেন কীভাবে?'

টিংকু কোনো উত্তর না দিয়ে বলল, 'এটা তো ঠিক, আপনি খেলাধুলা তেমন পছন্দ না করলেও কার্ড খেলতে প্রচণ্ড ভালোবাসেন এবং প্রতিদিনই এ খেলাটা খেলেন আপনি। সেটা বাসায় নয়, এবং—।' টিংকু থেমে যায়।

'না না, সংকোচের কিছু নেই। বড় কয়েকটা হোটেলে আমি নিয়মিত কার্ড খেলি এবং যথারীতি পয়সা দিয়ে খেলি। এক কথায় যাকে বলে জুয়া, জুয়া খেলি আমি।'

'থ্যাংক ইউ।' টিংকু এবার রিদওয়ান খানের চোখের দিকে তাকিয়ে বলে, 'আপনি আরেকটা জিনিস খুব পছন্দ করেন।'

রিদওয়ান খান বেশ উৎসাহী হয়ে বলেন, 'কী?'

'মাঝে মাঝে আপনি বাজি ধরেন।'

'জি।'

'আমরা এসেছি আপনার সঙ্গে একটা বাজি ধরতে।'

'বাজি ধরতে!' রিদওয়ান খান একটু সোজা হয়ে বসে বলে, 'কী ধরনের বাজি ধরতে চান আপনারা?'

'খুব সহজ একটা বাজি।'

'বলুন।'

টিংকু মুখটা হাসি হাসি করে বলে, 'বোটানিক্যাল গার্ডেন, রমনা কিংবা সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের বড় একটা গাছের নিচে দাঁড়াবেন আপনি। আমরা দুজন কয়েক হাত দূরে ঠিক আপনার সামনে দাঁড়াব। আপনি তখন আমাদের দিকে তাকাবেন। আমরা আপনাকে সম্মোহন করার চেষ্টা করব। কিন্তু আপনার কাজ হবে দু হাত অর্থাৎ আপনার ডান হাত ও বাঁ হাতটা একসঙ্গে আস্তে আস্তে উঁচু করা। উঁচু করতে করতে সেটা আপনার কানের ঠিক নিচে আনা। আমরা ঠিক তখনই আপনাকে শেষ সম্মোহন করার চেষ্টা করব, কিন্তু আপনি সেই সম্মোহনকে পাশ কাটিয়ে আপনার দু হাতের বুড়ো আঙুল আর তার পাশের আঙুল দিয়ে কানের নিচের অংশটা চেপে ধরবেন। এভাবে মাত্র দশ সেকেন্ড। আপনি এই দশ সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থাকতে পারবেন না, আপনার দু হাত ঝিঁঝি ধরে যাবে, আপনি হাত দুটো সরিয়ে আনবেন ঝট করে।'

'যদি পারি?' রিদওয়ান খান বেশ সিরিয়াসলি বলেন।

'আপনি পাবেন পঞ্চাশ হাজার টাকা।'

'না পারলে?'

'আমাদের দেবেন পঞ্চাশ হাজার টাকা।'

'না, পঞ্চাশ-টঞ্চাশ না, পুরো এক লাখ টাকা।'

টিংকু একটু ভেবে বলে, 'রাজি।'

'কোথায় হবে বাজিটা?'

'আপনি বলুন।'

'রমনার বড় গাছটার সামনে।' রিদওয়ান খান আগের মতোই উৎসাহী হয়ে বলেন।

'ওকে। কয়টায়?'

'বেলা এগারোটায়।'

রিদওয়ান খানের বাসা থেকে বের হয়ে রাস্তার মোড়টা ঘুরতেই দেখি, লিজা দাঁড়িয়ে আছে। আমরা এগিয়ে গেলাম তার দিকে। গাড়ির দরজাটা খুলে সে বলল, 'চলুন, আজকের দুপুরের খাবারটা আমি আপনাদের খাওয়াব।'

টিংকু একটু হেসে বলে, 'কিন্তু আপনি এখানে কেন?'

'আপনাদের দেখতে এসেছি।'

'কাল আপনি সারা দিন কী করবেন?'

'শখ করে আমি একটা নতুন গিফট আইটেমের দোকান দিয়েছি। দোতলা ধরনের দোকান। মানে ডুপ্লেক্স বাড়ির মতো আর-কি। দুই তলা মিলেই আমার দোকান। লেখাপড়া তো শেষ করলাম। আমার বাবার একটা জায়গা আছে ধানমন্ডিতে, দোকানটা সেখানেই দিয়েছি। সারা দিন ওই দোকানেই থাকি। কেন, আমাকে কোনো দরকার আছে?'

'রমনার বটমূল চেনেন আপনি?'

'হ্যাঁ, কতবার গিয়েছি সেখানে!'

'কাল বেলা এগারোটার আগে সেটার আশপাশে আপনি থাকতে পারেন। তবে সাবধানে থাকতে হবে। পারবেন?'

'সমস্যা নেই আমার।'

টিংকু কী যেন একটা ভেবে বলে, 'আচ্ছা, আপনার দোকানটা চলছে কেমন, ভালো?'

'মোটামুটি।'

'আপনার দোকানের বিক্রি আমরা বাড়িয়ে দিতে পারি।' টিংকু হাসতে হাসতে বলে।

লিজা বেশ উৎসাহী হয়ে বলে, 'কীভাবে?'

'একটু কৌশল করে।'

'আপনারা সম্ভবত তেমন কিছু করেন না, আমার দোকানে আপনারা জয়েন করতে পারেন।'

'ঠিক জয়েন না। সেলসম্যান হিসেবে আপনার দোকানে কয়েক দিন কাজ করতে পারি আমরা। আপনি তো দোকানেই থাকেন, দেখবেন কীভাবে আমরা জিনিস বিক্রি করি।'

লিজা হাসতে হাসতে বলে, 'নিশ্চয় ইন্টারেস্টিং কিছু, যেভাবে আমার কাছে মাউথওয়াশ বিক্রি করেছিলেন, সেভাবে?'

টিংকুও হাসতে হাসতে বলে, 'না, একেবারে অন্যভাবে।'

মহাখালী পার হয়ে জাহাঙ্গীর গেটের কাছে আসতেই টিংকু বলল, 'আমরা এখানে নামব।'

'এখানে কেন?' লিজা জিজ্ঞেস করে।

'ক্যান্টনমেন্টের ভেতর দিয়ে হাঁটব আমরা। খুব ভালো লাগে এখান দিয়ে হাঁটতে। মাঝে মাঝে মনে হয়, সারা দেশের সব রাস্তা যদি ক্যান্টনমেন্টের রাস্তার মতো হতো!'

'আমি আপনাদের খাওয়াতে চাইলাম যে?'

'আরেক দিন খাব।'

'ওকে। ও, ভালো কথা, কোনো কিছু লাগবে আপনাদের?'

'এক লাখ টাকা লাগবে।'

'কখন লাগবে?'

'প্রয়োজন কাল। আজকে টাকাটা দিলে ভালো হয়।'

'রাতের মধ্যে পেয়ে যাবেন টাকাটা।'

গাড়ি থেকে নেমে আসি আমরা। লিজা চলে যায়। কিন্তু যাওয়ার আগে ও আমাদের দিকে এমনভাবে তাকায়, সারা চোখে কৃতজ্ঞতা। হঠাৎ করে কেমন যেন খারাপ লাগতে শুরু করে মেয়েটার জন্য। এত বিত্তবৈভবে ভরা মেয়েটা, দেখে মনেই হয় না বুকের ভেতর প্রচণ্ড একটা দুঃখ নিয়ে ঘুরে বেড়ায় সে।

ক্যান্টমেন্টের ভেতর দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ হেঁটে আসি আমরা। টিংকু এতক্ষণ মাথা নিচু করে কী যেন ভাবছিল। হঠাৎ মাথা উঁচু করে বলে, 'চল তো, ওই সেলুনটায় যাই।'

'কোন সেলুনটায়?'

'ওই যে, দেশে পা রেখেই প্রথমে আমরা যে সেলুনটায় গিয়েছিলাম।'

'অ, স্টাইল হেয়ার কাট সেলুন?'

'হ্যাঁ, স্টাইল হেয়ার কাট সেলুন। চল, শেভ করে আসি।'

বাসায় ফিরতেই বদিউল ভাই দৌড়ে এসে বললেন, 'একটা ঘটনা ঘটে গেছে ভাই, মারাত্মক ঘটনা।'

'কী হয়েছে!' টিংকু কিছুটা চমকে উঠে বলে।

'জলিল তো পালিয়েছে।'

'কখন?'

'দুপুরে তো এই মেসবাড়িতে কেউ থাকে না, তখন পালিয়েছে।'

'অসুবিধা কী, আমরা আরেকজন লোক ঠিক করব।'

'সেটা নাহয় ঠিক করলাম, কিন্তু ও তো আমাদের সাড়েসর্বনাশ করে পালিয়েছে। আমাদের সবার লুঙ্গি, গামছা, কাপড়চোপড় নিয়ে পালিয়েছে। সারা দিন পরিশ্রম করে আসার পর এখন গোসল করে কী পরব, সেটাও রেখে যায়নি। সব নিয়ে গেছে ও।'

'তাই নাকি!'

'আরো একটা কেলেঙ্কারি করে গেছে।'

'কী?'

'পাশের বাসার কাজের মেয়েটাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেছে ও।'

'কি!' টিংকু প্রচণ্ড অবাক হয়ে বলে, 'জলিলের সঙ্গে গেছে মেয়েটা! এটা কী বললেন আপনি!'

'ঘটনা আরো একটা আছে। কাজের মেয়েটা যে বাড়ির, ওই বাড়ির মালিক তো আমাদের বাড়ির মালিককে শাসিয়ে গেছেন, তার বিরুদ্ধে নাকি কেস করবেন তিনি।'

'বলেন কি!'

'আপনি বরং আমাদের বাড়িওয়ালার সঙ্গে একটু দেখা করে আসুন। তিনি অস্থির হয়ে গেছেন, আপনাদের খুঁজছিলেন।'

খবিউর চাচার বাসায় ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে দৌড়ে এসে টিংকুর হাত চেপে ধরে তিনি বললেন, 'দেখো তো, কী কেলেঙ্কারি ঘটনা! কার মাইয়া কে নিয়া পলাইল, আর কেস খামু আমি! জীবনে কখনো জেলের ভাত খাই নাই। এই বয়সে আইসা জেলের ভাত খামু নাকি!'

'কে বলল আপনাকে জেলের ভাত খেতে হবে? ওসব নিয়ে আপনাকে চিন্তা করতে হবে না, স্যার। ব্যাপারটা আমি দেখছি।'

'দেখো তো বাবা। দুশ্চিন্তায় আমার কিচ্ছু ভালো লাগতেছে না।'

'মফিজ সাহেবকে তো দেখলাম না। এই সময় তো ওনার একটা ভূমিকা থাকা দরকার। সে আপনার ম্যানেজার, সবকিছু ম্যানেজ করার দায়িত্ব তো তারই।'

'ওই হারামজাদার কথা কইয়ো না। বড্ড ধড়িবাজ। কাজের সময় নাই, খালি অকাজের সময় আইসা হাজির।'

'স্যার, আমার কী মনে হয় জানেন? জলিল পালায়নি, কেউ তাকে পালাতে বলেছে।'

'কে, কোন বদমাইশ তাকে পালাইতে বলছে?' চিৎকার করে ওঠেন খবিউর মোল্লা।

'আপনার বয়স হয়েছে, আপনি উত্তেজিত হবেন না। চিন্তা করবেন না, আমি পাশের বাসার ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলে আসি।'

'কোন ভদ্রলোক?'

'যার বাড়ির কাজের মেয়েকে নিয়ে জলিল পালিয়েছে।'

'ও আবার ভদ্রলোক নাকি! ছোটলোক, একেবারে ছোটলোক।'

পাশের বাসায় এসে কলবেল টিপতেই ভদ্রলোক নিজে খুলে দিলেন দরজাটা। হাসি হাসি মুখ করে আমাদের দিকে তাকালেন তিনি। তার হাতে একটা ধাঁধার বই, বইটা হাতে মেলে ধরা, সম্ভবত বইটা তিনি পড়ছিলেন। তিনি বললেন, 'বাবারা, কাকে চাও তোমরা?'

'আপনার কাছেই এসেছি আঙ্কেল।'

'আসো, ভেতরে আসো।' দরজা থেকে সরে দাঁড়িয়ে লোকটা বললেন, 'বসো, ওই সোফাতে বসো।' তিনিও একটা সোফায় বসতে বসতে বললেন, 'কী ব্যাপার, বলো তো?'

'আপনি খুব ভালো একজন মানুষ, তা আপনাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে।' টিংকু বিনয়ের অবতার হয়ে বলল।

'তাই নাকি!'

'আপনাকে দেখলে মনে হয়, আপনি খুব সাধারণ জীবন যাপন করেন। কিন্তু সেই জীবন যাপনের ভেতরও একটা বনেদি ভাব আছে, একটা আদি মর্যাদার ভাব আছে।'

'ভালোই তো বলছ তুমি!'

'আপনার মতো এ রকম একজন সম্মানীয় মানুষের উচিত আরো আরো উঁচু ধরনের মানুষের সঙ্গে মেশা। আপনার কখনোই উচিত না ওই পাশের বাসার খবিউর মোল্লার মতো খবিস একটা লোকের সঙ্গে তর্কে যাওয়া। তিনি আপনার সঙ্গে মেশা তো দূরের কথা, কথা বলার যোগ্যতাও রাখেন না!' টিংকু মাথা নিচু করে কথা বলছিল। কথাটা শেষ করেই ও বাড়িওয়ালার চোখের দিকে তাকায়।

'তোমরা ব্যাপারটা জানলে কী করে?'

'যেভাবেই হোক জেনেছি আঙ্কেল।'

'তোমরা কি জানো ওই লোকটা কত খারাপ! ওই যে মেসবাড়িটা করেছে, ওটা কিন্তু সরকারি জমি দখল করে বানানো। নিজের জমিই যদি হবে, তাহলে পাঁচ-ছয়তলা বিল্ডিং বানাস না কেন। ওই যে বললাম, সরকারি জমি। সারাক্ষণ মনের ভেতর ভয়, কখন এসে ভেঙে দিয়ে যায়। আর ওই মেসবাড়িটা এমন সব মানুষকে ভাড়া দিয়েছে, তারা সবাই ইতর শ্রেণীর।'

টিংকু খুক্ করে কেশে বলল, 'জি, আমারও তা-ই মনে হয়।' টিংকু একটু সোজা হয়ে বসে বলে, 'ধাঁধা পড়তে খুব পছন্দ আপনার?'

'খুব পছন্দ। তোমরা পছন্দ করো?'

'জি, অল্প একটু করি।'

'আচ্ছা, একটা ধাঁধার উত্তর দাও তো দেখি—পাঁচ ছেলে তুলে দিল বত্রিশ ছেলে ঘাড়ে, দূরে ছিল দাসী বুড়ি টেনে নিল তারে। মানে কী এটার?'

টিংকু ঝট করে উত্তর দেয়, 'ভাত খাওয়া।'.

'বাহ্, ভালোই তো পারলে! আরেকটা ধাঁধার উত্তর দাও তো—ঝাঁকড়া চুলের মাথা, কোদলা কোদলা গা; আগায় কলসি বাইন্ধা, গিলে গিলে খা। এটার মানে কী?'

আগের মতোই টিংকু ঝট করে বলে, 'খেজুরগাছ।'

'বাহ্, এটাও তো পারলে।'

'এবার আমি একটা ধাঁধা বলি আঙ্কেল। আপনি তার উত্তর দেবেন।' টিংকু হেসে হেসে বলে।

'বলো বলো। জীবনে আমাকে কেউ ধাঁধা ধরে হারাতে পারেনি। ধাঁধা নিয়ে অনেক বাজি ধরেছি আমি এবং সবগুলোতেই জিতেছি।'

'আমিও ধাঁধা নিয়ে একটা বাজি ধরতে চাই।'

'যেমন?'

'আমি যে ধাঁধাটা বলব, যদি আপনি সেটার উত্তর দিতে না পারেন, তাহলে আপনি আমাদের এক হাজার টাকা দেবেন, আর আমরা না পারলে আমরা আপনাকে দেব পাঁচ শ টাকা।'

'আমি এক হাজার টাকা কিন্তু তোমরা পাঁচ শ টাকা কেন?'

'আপনি একজন বাড়ির মালিক, আপনি তাই এক হাজার টাকা; আমরা বেকার মানুষ, আমরা তাই পাঁচ শ টাকা।'

হাসতে হাসতে বাড়িওয়ালা বললেন, 'অ আচ্ছা। ঠিক আছে, তোমার ধাঁধাটা বলো।'

টিংকু বেশ প্রস্তুতি নিয়ে বলল, 'এমন একটা গাছের নাম বলুন, যার পাতা থাকে মাটির নিচে, শেকড় থাকে মাটির ওপরে?'

বেশ কিছুক্ষণ ভাবলেন বাড়িওয়ালা। তারপর মাথা এদিক-ওদিক ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে পকেট থেকে দুটো পাঁচ শ টাকা নোট বের করে টিংকুকে দিয়ে বললেন, 'পারছি না। এবার তুমি বলো, গাছটার নাম কী?'

বাড়িওয়ালার দেওয়া দুটো পাঁচ শ টাকার নোট থেকে একটি নোট ফিরিয়ে দিয়ে টিংকু বলল, 'আমিও পারি না।'

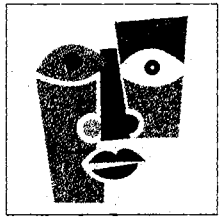

হাত দুটো একসঙ্গে করে কচলাতে কচলাতে মফিজ বলল, 'টিংকু ভাই, আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।'

ঘুম থেকে উঠে বিছানায় বসে ছিল টিংকু। ও সাধারণত এত সকালে ঘুম থেকে ওঠে না। রমনা পার্কে যেতে হবে এগারোটার আগেই, সে জন্যই আজ একটু তাড়াতাড়ি ওঠা। হাই ছাড়তে ছাড়তে টিংকু মফিজের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বলুন।'

'একটু বাইরে এলে ভালো হয়।'

'কোনো গোপন কথা?'

'তেমন গোপন কথা না। জরুরি একটা কথা।'

'গোপন কথা না হলে এখানেই বলুন।' টিংকু চারপাশটা তাকিয়ে বলল, 'সুমিত ছাড়া তো আশপাশে কেউ নেই।'

'আপনার পাশে একটু বসি।'

টিংকু সরে বসে। মফিজ বেশ বিনয়ী ভাব নিয়ে পাশে বসে ওর। কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকার পর ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে মফিজ বলে, 'বাড়িওয়ালা সাহেবের ধারণা, জলিল যে পালাইছে সেইটা আমি জানি।'

'আপনি জানেন না?'

'আমি জানুম কী কইরা!'

'কিন্তু আমি তো জানি আপনি জানেন।'

'কীভাবে?'

'জলিল বলেছে।'

'জলিল বলছে!' মফিজ বেশ খেপে গিয়ে বলে, 'ওই কুত্তার বাচ্চা আপনাকে কী বলছে?'

'কী বলেছে, সেটা শোনার দরকার নেই। তবে ও যে পালাবে, এটা আপনি জানতেন।'

মাথা নিচু করে ফেলে মফিজ। টিংকু মুচকি হেসে বলে, 'আপনার সমস্যা কী এখন?'

'বাড়িওয়ালা সাহেব আমাকে চাকরি থিকা বাদ দিয়েছেন।'

'বাদ দিয়েছেন অসুবিধা কি, আরেকটা চাকরি করবেন!'

'এই বাজারে সহজেই কি চাকরি পাওয়া যায়! তা ছাড়া আমাদের লেখাপড়ার দৌড়ও তেমন কিছু না।' মফিজ কাঁদো কাঁদো গলায় বলে, 'দুইটা বাচ্চা আছে আমার। কী যে হইব!'

টিংকুর মুচকি হাসির মুখটা ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে যায়। কারো কোনো দুঃখের কথা শুনলেই মন খারাপ করে ফেলে ও। অনেকবার আমি ওর এই ব্যাপারটা খেয়াল করেছি। মহাখালী বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে আছি আমরা একদিন। ঈদের ছুটিতে বাড়ি যাব। বোরকা পরা এক মহিলা এসে হাত পেতে বললেন, 'বাবারা, আমার বড় মেয়েটার বিয়ে, একটু সাহায্য দরকার আমার।'

মহিলার গলার স্বর খুব সুন্দর এবং ব্যক্তিত্বময়। উচ্চারণও পুরোপুরি শুদ্ধ। টিংকু খুব আন্তরিকভাবে তাকে বলল, 'সত্যি আপনার মেয়ের বিয়ে?'

'আমি মিথ্যা বলি না বাবা।'

'কত টাকা দরকার আপনার?'

'কত যে দরকার!'

'মেয়ের বাবা নেই?'

'না।'

'চাচা-মামা?'

'তারা আছে।'

'তারা কোনো সাহায্য করবে না?'

'তারা সবাই গরিব বাবা। প্রতিবার মেয়েটার বেশ ভালো ভালো বিয়ে আসে, টাকার অভাবে দিতে পারি না। মেয়েটার বয়স হয়ে যাচ্ছে, ওর মুখের দিকে তাকানো যায় না ইদানীং। অনেক কষ্টে, লজ্জা-শরম ধুলোয় মিশিয়ে রাস্তায় নেমেছি বাবা। নিয়ত করেছি, বিয়ের টাকা জোগাড় না করে বাড়িতে

ফিরব না। এতে যদি রাস্তায় আমাকে মরতে হয়, তাহলে এখানেই মরব। ব্যর্থ মা হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া ভালো।' মহিলার গলার স্বর ভিজে আসে, টিংকুর চোখও ছলছল করে ওঠে।

আমরা দুজন তখন একটা কোম্পানিতে চাকরি করি। বেতন পেয়েছি, বোনাস পেয়েছি। কোনো কথা না বলে টিংকু ওর পকেট থেকে সবগুলো টাকা বের করে মহিলাটির হাতে দিয়ে দেয়। তারপর আমাকে বলে, 'তুই বাড়ি যা, আমি এবার যাব না।'

মাথা নিচু করে বসে আছে মফিজ। টিংকু তার কাঁধে একটা হাত রেখে বেশ আত্মবিশ্বাস নিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, আপনি আপনার রুমে যান। দেখি, আমি কী করতে পারি।'

কথাটা শেষ করেই বাড়িওয়ালার বাসায় গেল টিংকু। কিন্তু তাকে কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে টিংকু বলল, 'স্যার, পৃথিবীতে সত্যিকারের মানুষ কে, জানেন?' বাড়িওয়ালা কিছু বলে না। টিংকু তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, 'যিনি ক্ষমা করতে পারেন। স্যার—।' বাড়িওয়ালার একটা হাত চেপে ধরে টিংকু বলে, 'মফিজ সাহেবকে আপনি ক্ষমা করে দিন। মানুষ তো, ভুল হতেই পারে। আমি ওনার পক্ষ থেকে আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি।'

মুগ্ধ হয়ে বাড়িওয়ালা টিংকুর কথা শুনলেন। মুখটা হাসি হাসি হয়ে গেছে তার। খুব আস্তে করে স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলে টিংকু, যাক, ক্ষমা পেয়ে গেছে মফিজ।

দ্রুত বাসার ফিরছি আমরা। কয়টা যে বাজে, এগারোটার আগে রমনায় পৌঁছতে হবে। কিন্তু বাসার সামনে এসেই দেখি, লিজা দাঁড়িয়ে আছে। টিংকুকে দেখেই হেসে হেসে বলল, 'টাকাটা দিতে এলাম।'

'কাল রাতে দেয়ার কথা ছিল।'

'একটা সমস্যা ছিল আমার।'

'অবিশ্বাসজনিত সমস্যা না তো?'

লিজা মুখটা গম্ভীর করে বলে, 'বিশ্বাস-অবিশ্বাস কি এতই ঠুনকো!'

'স্যরি।' টিংকু দুঃখ প্রকাশ করে হেসে হেসে।

'আমি আপনাদের জন্য এখানে ওয়েট করছি, আপনারা যত দ্রুত সম্ভব রেডি হয়ে আসুন। একসঙ্গে যাব আমরা।'

খুব জোরে একটা নিঃশ্বাস নিল টিংকু। তারপর লিজার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কিছু বুঝতে পারছেন?'

লিজা আগ্রহ নিয়ে বলে, 'কী?'

'অদ্ভুত একটা ঘ্রাণ পাচ্ছি আমি। গাছের ঘ্রাণ, পাতার ঘ্রাণ, ঘাসের ঘ্রাণ— সবুজের ঘ্রাণ।'

'সবুজের আবার ঘ্রাণ আছে নাকি?' লিজা হাসতে থাকে। রূপবতী মেয়েদের সব সুন্দর, হাসিও সুন্দর।

'আছে। সেই ঘ্রাণ পাওয়ার জন্য আলাদা একটা নাক লাগে। কংক্রিটে মোড়া এই শহরে বাস করতে করতে সেই নাকটা সবার গজায় না। এ ছাড়া প্রতিনিয়ত কৃত্রিম ঘ্রাণের মধ্যে বাস করে অন্য কোনো ঘ্রাণ তারা টেরই পায় না।'

লিজা হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, 'যদি কিছু মনে না করেন, একটা প্রশ্ন করতে পারি?'

'একটা না, আপনার যতগুলো ইচ্ছে করতে পারেন।'

'আপনার কোয়ালিফিকেশন— ।'

এইটুকু বলেই লিজা থেমে যায়। টিংকু হাসতে হাসতে বলে, 'আমরা দুজনই মাস্টার্স কমপ্লিট করেছি।'

'কিন্তু— ।'

লিজা এবারও কথা শেষ করে না।

'কিন্তু আমরা এসব কাজ কেন করছি? আপনার প্রশ্ন এটাই তো?' টিংকু একটু গম্ভীর হয়ে বলে, 'অন্য একদিন বলব, যদি আপনি শুনতে চান।'

'আমার এখনই শুনতে ইচ্ছে করছে।'

'এখন না।' টিংকু সামনের দিকে তাকিয়ে বলে, 'আমরা এসে গেছি। আপনি কোনো গাছের আড়ালে দাঁড়াবেন, না গাড়িতে গিয়ে বসবেন?'

'আমি এখানেই কোথাও দাঁড়াতে চাই।' লিজা ওর ব্যাগ থেকে টাকার বান্ডিলটা টিংকুর হাতে দিতে দিতে বলে, 'আমার অনেক দিনের একটা স্বপ্ন

পূরণ হতে যাচ্ছে আজ। কী আনন্দ হচ্ছে!' লিজা আনন্দের কথা বলছে, কিন্তু ছলছল করে ওর চোখ দুটো।

রমনার বড় গাছটার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন রিদওয়ান খান, একা। আমাদের দেখেই কিছুটা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, 'কয়েক মিনিট লেট আপনারা। আমি তো ভেবেছিলাম আসবেনই না।'

'স্যরি, রাস্তায় জ্যাম ছিল।'

'ওকে। অন্য রকম একটা বাজি খেলতে যাচ্ছি আজ আমি, এবং অবশ্যই জিতব। তারপর বন্ধুবান্ধব নিয়ে সারা রাত আনন্দ করব। ভাবতেই খুব ভালো লাগছে আমার।'

'আপনার বোধহয় সময় কম, আমরা বরং শুরু করি।'

'ইয়েস।'

রিদওয়ান খান রমনার বড় গাছটার সামনে দাঁড়ান। বেশ কয়েক হাত দূরে থেকে তার সামনে গিয়ে দাঁড়ায় টিংকু। তারপর ইশারা করে রিদওয়ান খানকে ওর দিকে তাকাতে বলে।

রিদওয়ান খান তাকাতেই টিংকু বলে, 'আপনি আমার চোখের দিকে তাকান। আমি আপনাকে সম্মোহন করা শুরু করব, আর আপনি সেই সম্মোহন কাটিয়ে আস্তে আস্তে আপনার হাত দুটো ওপরের দিকে তুলতে থাকবেন এবং দু হাতের দু আঙুল দিয়ে চেপে ধরবেন কানের নিচের অংশটা।'

'ওকে।' রিদওয়ান খান তার হাত দুটো সোজা করলেন। তারপর একটু একটু করে উঁচু করতে লাগলেন হাত দুটো। টিংকু চোখ মেলে তাকিয়ে রইল তার চোখের দিকে। ওকে দেখে মনে হচ্ছে সম্মোহনটা ও ভালোই করা জানে। চোখ দুটো বেশ বড় বড় হয়ে গেছে ওর, রিদওয়ান খানও আস্তে আস্তে হাত দুটো উঁচু করে ফেলেছে বেশ। আমি মুগ্ধ হয়ে দুজনকে দেখছি।

এক মিনিট শেষ না হতেই রিদওয়ান খান হাত দুটো দু কানের নিচে আনলেন। দু সেকেন্ড অপেক্ষা করলেন তিনি, তারপর ঝট করে ধরে ফেললেন তার কান দুটো। দশ সেকেন্ড এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। এক সেকেন্ড, দুই সেকেন্ড, তিন সেকেন্ড...। আমি খেয়াল করলাম টিংকু ওর হাতটা বুকের কাছে এনে আলতো চাপ দিল। দশ সেকেন্ড শেষ। রিদওয়ান খান কিছুটা

লাফিয়ে উঠে সামনের দিকে এগিয়ে এসে হাসতে হাসতে বললেন, 'আমি জিতে গেছি, আমি জিতে গেছি... ।'

'ইয়েস, আপনি জিতে গেছেন ।' টিংকু ওর পকেট থেকে এক লাখ টাকার বান্ডিলটা বের করে রিদওয়ান খানের হাতে দিয়ে বলে, 'নিন ।'

টাকাটা হাতে নিয়ে রিদওয়ান খান বললেন, 'এত সহজ একটা বাজি ধরলেন কেন আপনারা? আপনাদের এক লাখ টাকা লস হলো ।'

'না, লস হয়নি ।' টিংকু মুচকি হেসে বলে, 'দুই লাখ টাকা লাভ হয়েছে আমাদের ।'

'কীভাবে!'

'আমরা একজনের কাছ থেকে তিন লাখ টাকা নিয়েছিলাম ।'

'কেন?'

'আপনাকে দশ সেকেন্ড কান ধরিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখব, এই জন্য!'

চোখ দুটো বড় বড় হয়ে গেছে রিদওয়ান খানের। টিংকু সেদিকে না তাকিয়ে ওর মুখের হাসিটা আরো একটু বাড়িয়ে দিল। তারপর আমাকে ইশারা করে চলে এলো সে বেশ গর্বিত ভঙ্গিতে।

লিজা বসে আছে রমনা পার্কের সামনের রাস্তায় রাখা ওর গাড়িতে। আমাদের দেখেই গাড়ির দরজা খুলে দিল ও নিজেই। গাড়িতে উঠে বুকের কাছে শার্টের সঙ্গে লুকানো মিনি ক্যামেরাটা বের করে লিজার হাতে দিয়ে টিংকু বলল, 'আশা রাখি আপনার কাজটা সঠিকভাবে করে দিতে পেরেছি ।'

'থ্যাংক ইউ ।' ক্যামেরাটা হাতে নিয়ে ব্যাগে রাখতে রাখতে লিজা বলল, 'বাকি দু লাখ টাকা কখন নেবেন?'

'আপনার মোবাইল নম্বরটা দিন। যখন সুবিধা হবে ফোন করে চেয়ে নেব। এর আগে একটা জিনিস জানতে চাইছি আমি, যদি আপনার আপত্তি না থাকে ।'

'এই কাজটা কেন করলাম?'

'জি ।'

বেশ কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে বসে থাকার পর দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছাড়ল

লিজা। তারপর মাথাটা উঁচু করে বলল, 'রিদওয়ানের সঙ্গে আমার বড় বোনের একটা সম্পর্ক ছিল। দু বছর কন্টিনিউ করার পর সম্পর্কটা ভেঙে দেয় ও। এর পর থেকে আমার বোনটা বেশ অ্যাবনরমাল। একটা মানুষ যে কত খারাপ হতে পারে, রিদওয়ানকে দেখার আগে আমি জানতাম না।'

'এই যে ছবিটা তুলে দিলাম, এটা দিয়ে কী হবে?'

'কাল দেখতে পারবেন সেটা।' লিজা একটু সোজা হয়ে বসে বলে, 'আপনারা আমার দোকানে কয়েক দিন কাজ করতে চেয়েছিলেন।'

'কাজ করা সম্ভবত হবে না। তবে জিনিস বিক্রির কায়দাকানুনটা শিখিয়ে দিতে পারি আপনাকে।'

'বলুন।'

'দুটো স্মার্ট ছেলে রাখতে হবে আপনাকে।'

'স্মার্ট ছেলেই রাখতে হবে, মেয়ে রাখলে হবে না?' লিজা হাসতে হাসতে বলে।

'মেয়ে রাখলেও চলবে, তবে ছেলে রাখলে ভালো হবে।'

'ঠিক আছে, ছেলেই রাখলাম। তারপর বলুন।'

'আপনার তো ডুপ্লেক্সের মতো দোতলা দোকান। একজন থাকবে দোকানের ওপরের তলায়, আরেকজন থাকবে নিচে। কোনো কাস্টমার এসে একটা জিনিস নিতে চাইলে নিচের জন ওপরের জনকে জিজ্ঞেস করবে—জিনিসটার দাম কত? ধরুন জিনিসটা দাম একশ টাকা, ওপর থেকে ছেলেটা বলবে আড়াই শ টাকা। নিচের ছেলেটা কানে কম শোনার ভান করবে। সে বলবে, কত, দেড় শ টাকা? ওপরের ছেলেটা কোনো জবাব দেবে না। নিচের ছেলেটা তখন কাস্টমারকে বলবে, দিন, দেড় শ টাকা দিন। কাস্টমার ভাববে, আরে, ওপর থেকে জিনিসটার দাম চাইল আড়াই শ টাকা, আর এ ছেলেটা চাইছে দেড় শ টাকা! কাস্টমার তখন কোনো কথা না বলে দ্রুত টাকা দিয়ে জিনিসটা নিয়ে যাবে। এভাবেই প্রতিটা কাস্টমারের কাছে জিনিস বিক্রি করতে হবে।'

'ভেরি ইন্টারেস্টিং তো!'

'হ্যাঁ, ভেরি ইন্টারেস্টিং।'

লিজা ওর ব্যাগ থেকে একটা মোবাইল ফোন বের করে বলে, 'আমার

মোবাইল নম্বরটা আপনাদের দিলেও আপনারা আমাকে কখনো ফোন করবেন বলে মনে হয় না। আমার কয়েকটা মোবাইল আছে। আমি বরং আমার একটা নম্বর এই মোবাইলে সেভ করে আপনাদের দিয়ে দিই, আমিই আপনাদের ফোন করে খুঁজে নেব।'

টিংকু ঝট করে সোজা হয়ে বসে বলল, 'না না, মোবাইল লাগবে না, আমরা অবশ্যই আপনাকে ফোন করব। টাকাটা নেব না আমরা!'

'আমার মনে হয় আপনারা টাকাটাও নেবেন না।'

টিংকু বেশ কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলে, 'আপনার জন্য আর কী করতে পারি আমরা?'

'কিছুই না।' দীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে লিজা বলে, 'আমি যা চাই, তার জন্য আপনি আর কিছুই করতে পারবেন না।'

বাসায় পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে বদিউল ভাই দৌড়ে এলেন টিংকুর কাছে। তারপর নিচু হয়ে ওর পায়ে হাত দিয়ে সালাম করতেই টিংকু হা হা করে উঠে বলল, 'এটা কী করছেন, বদিউল ভাই!'

'সালাম করলাম ভাই। আপনি আমার চেয়ে ছোট, তাই বলে কি সালাম করা যাবে না আপনাকে? কোথাও লেখা আছে যে ছোটদের সম্মান করতে হয় না?'

'কিন্তু হঠাৎ করে এই সালাম করার কারণ কী?'

'আপনার দোয়ায় আমার ছোট ভাইটা জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে।'

'তাই নাকি! কোথায় উনি?'

'ঘুমাচ্ছে। এ কয়দিন ঠিকমতো ঘুমাতে পারে নাই। তাই ছাড়া পেয়েই মড়ার মতো ঘুমাচ্ছে।' বদিউল ভাই সারা শরীরে আনন্দ নিয়ে বলেন, 'ভাই, আমি টুকটাক রান্না করতে পারি। খুব যে খারাপ হয়, তা না। আজ আমি নিজের টাকা দিয়ে আলাদাভাবে বাজার করে নিজ হাতে রান্না করেছি।'

'খুবই ভালো সংবাদ।'

'আপনারা গোসল সেরে আসেন, আমি খাবার রেডি করি। বাড়িওয়ালা সাহেবকেও দাওয়াত দিয়েছি, উনি এখনই এসে পড়বেন।'

খাবার খেতে নিতেই মফিজ কাঁটা বিঁধিয়ে ফেলল গলায়। তা দেখে বাড়িওয়ালা বললেন, 'একটু আস্তে আস্তে খা। মাগনা খাবার তো, তাই চোখকান বুজে খাচ্ছিস, না? রাক্ষস কোথাকার!'

বিকেলের দিকে বদিউল ভাই চা বানিয়ে এনে আমাদের দিতে দিতে বললেন, 'কাল বাড়ি চলে যাব ভাই। অনেক দিন তো এখানে থাকলাম। কবে আর দেখা হয় বলতে পারছি না। ভুলত্রুটি হয়ে থাকলে মাফ করে দিয়েন।'

বদিউল ভাই কাঁদছেন, 'এত দিন করেছি এক চিন্তা, এখন করতে

হবে আরেক চিন্তা। এ কয়দিনে সব শেষ করে ফেলেছি ভাই, এখন যে জীবনটা কীভাবে চলবে—!' চিৎকার করে ওঠেন বদিউল ভাই। চোখে পানি এসে যায় আমাদের।

রাতে টিংকু আমাকে ফিসফিস করে বলে, 'চল, বাড়িওয়ালার বাড়ি যাই, শেষ কাজটা করে আসি।'

বাড়িওয়ালার ঘরে ঢুকেই টিংকু কিছুটা হন্তদন্ত হয়ে বলল, 'স্যার, একটা সমস্যা নিয়ে এসেছি।'

'কী সমস্যা, বলো?'

'বেয়াদবি নেবেন না, আপনার কাছে যেন আমরা কত টাকা রেখেছি স্যার?' টিংকু বিনয়ে গলে যায়।

'তিন লক্ষ বিশ হাজার টাকার মতো।'

'ইস্!' টিংকু জিভ দিয়ে আফসোসের শব্দ করতে থাকে।

'কী হইছে তোমাদের? কোনো সমস্যা?' বাড়িওয়ালা বেশ উদ্বিগ্ন হয়ে যান।

'না মানে—।' টিংকু বেশ লজ্জিত ভঙ্গিতে বলে, 'আপনি তো জানেন আমরা শেয়ারের ব্যবসা করি। কাল কয়েকটা শেয়ার কিনব ভাবছিলাম। বেশ লাভ হবে তাতে। কিন্তু—।'

'কিন্তু কী?'

'আমাদের দরকার পাঁচ লাখ টাকা, আছে—?'

'অ, এই সমস্যা।' বাড়িওয়ালা বেশ উৎফুল্ল হয়ে বলেন, 'সমস্যা কি, বাকি টাকা আমি দিমু। লাভ হইলে কিছু লাভ আমাকে দিয়ো। আমি তো ব্যাংকে তেমন টাকা রাখি না, যা রাখি বাড়িতেই রাখি। টাকাটা তাহলে এখনই নিয়া যাও, না সকালে নিবা?'

'সকালে আর আপনাকে ডিস্টার্ব করতে চাই না স্যার।'

বাসার ভেতর গিয়ে একটা ব্যাগে করে টাকাগুলো এনে টিংকুর হাতে দিয়ে বাড়িওয়ালা বলেন, 'শেয়ার কিনতে গিয়া আবার বেশি লোভ কইরো না, বেশি লোভ করা কিন্তু ভালো না।'

টিংকু আগের মতোই বিনয়ী হয়ে বলে, 'জি স্যার, জি স্যার।'

খুব সকালে বাসা থেকে বের হয়ে এসেছি আমরা, তখনো ঘুম থেকে ওঠেনি কেউ। এর আগে দুই লাখ টাকার দুটো বান্ডিল একটা প্যাকেটে ভরে রেখে এসেছি বদিউল ভাইয়ের বালিশের পাশে, সঙ্গে ছোট্ট একটা চিঠি। এ বাসাটায় ফেরা হবে না আমাদের আর কখনো, কোনো দিন।

রিকশায় যাচ্ছি আমরা, কিন্তু ঠিক কোথায় যাচ্ছি বুঝতে পারছি না। সারা ঢাকা শহরের দেয়াল, গাছ, রাস্তার সাইনবোর্ডে একটা পোস্টার টাঙানো। রিদওয়ান খান কান ধরে দাঁড়িয়ে আছেন, নিচে লেখা—কে এই ফ্রড! কোন বাজে কাজ করে কান ধরে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। চরম একটা প্রতিশোধ নিয়েছে লিজা।

আশুলিয়ার ভেতর ছোট্ট একটা নদীর পাশে বসে আছি আমি আর টিংকু। ওর সামনে বাকি টাকার বান্ডিলগুলো। বান্ডিল থেকে ও একটা একটা করে টাকার নোট বের করছে আর নোটটা দুমড়ে-মুচড়ে গোল করে নদীর পানিতে ফেলে দিচ্ছে। হালকা বাতাস, হালকা স্রোতে গোলাকার টাকাগুলো চলে যাচ্ছে ছোট ছোট কাগজের নৌকার মতো।

মন খারাপ হলেই মরক্কোর একটা ছোট্ট নদীর পাশে আমি আর টিংকু এভাবে বসতাম। সারা দিন অমানুষিক পরিশ্রম করার পর এভাবে বসে থেকে কত রাত কাটিয়ে দিয়েছি আমরা, তারপর সকালে আবার গিয়েছি দাসত্ব করতে। মাঝে মাঝে মরক্কোর মিষ্টি মেয়ে উমরাহ এসে বলত, 'তোমাদের মন খারাপ?' টিংকু উত্তর দিত, 'হ্যাঁ। তবে সেটা আমাদের কষ্টে না, অন্যের কষ্টমুখর জীবনের কথা ভেবে।' উমরাহ অবাক হয়ে বলত, 'মানুষ এখনো অন্যের কষ্টে মন খারাপ করে?' টিংকু ম্লান হেসে বলত, 'করে, আর করে বলেই এখনো আকাশের কান্নায় বৃষ্টি ঝরে, বেদনায় ঘাসফুল নীল হয়ে ফোটে, কখনো কখনো পৃথিবীটা থেমে যায় একদম চুপচাপ, একটা গাছের পাতাও

নড়ে না। মাঝে মাঝে এমন হয়, কষ্টে চোখের মণি দুটো বড় হয়ে যায়, তখন এখানে, ঠিক এখানে এসে মাকে ডাকি—মা... মা...। পাহাড়ের গা থেকে সে ডাক আবার আমার কাছে ফিরে আসে; মনে হয়, মা যেন উত্তর দিচ্ছে—খোকা... খোকা...। আমি আবার ডাকি—মা... মা... মা রে...।' কথাটা বলতে বলতে টিংকু চিত হয়ে শুয়ে পড়ত, চোখের কোনা দিয়ে পানি ঝরত তার। এরপর একটু থেমে উমরাহকে বলত, 'জানেন, কত দিন মাকে দেখি না, মাকে ডাকি না, জীবনের তাগিদে দেশ ছেড়ে এই দাসত্ব করতে এসে মা ডাকটা প্রায় ভুলেই গেছি...!'

কোনো কোনো ছুটির দিন আমরা সারা এলাকা ঘুরে বেড়াতাম। আর পালানোর পথ খুঁজতাম—লিবিয়া, আলজেরিয়া, মরক্কো; তারপর... ওই তো, ওই তো স্পেন, আমাদের স্বপ্নের ইউরোপ। ডলার, ইউরো, গাড়ি, বাড়ি, ধন-দৌলত—স-ব। কখনো কখনো দুঃখে পাথর হয়ে যেতাম। বাবা-মাকে নিঃস্ব করে, জমিজমা বিক্রি করে দালাল ধরে এই বিদেশে আসা। কিন্তু ইউরোপের কথা বলে তারা কোথায় রেখে গেছে আমাদের। মরুভূমি, জঙ্গল, সাগর, নদী পার হয়ে লিবিয়া, আলজেরিয়া, মরক্কো। তারপর স্পেনের পথে পা দিয়ে কিছুদূর এগিয়ে যেতেই ধরা পড়া, অবশেষে দেড় বছর জেল খাটিয়ে দেশে পাঠিয়ে দেওয়া।

কত দিন আমরা না-খেয়ে থেকেছি, মরতে মরতে বেঁচে গেছি ১২ জনের সাতজন, পানির পিপাসায় মাটি খুঁড়ে ভেজা ভেজা মাটি মুখে নিয়ে থেকেছি অনেক দিন। মশার কামড়, পোকা-মাকড়ের কামড়ে ঘা হয়ে গেছে আমাদের শুষ্ক শরীরে। ঘাগুলো এখানো আছে—আমাদের হাতে, পায়ে, শরীরে। এমনকি মনেও!

মানুষ মানুষকে এভাবে ঠকায়! দেশের মানুষ আমাদের ঠকিয়েছে, যেখানে নিয়ে যাওয়ার কথা সেখানে নিয়ে যায়নি; বিদেশের মানুষ আমাদের ঠকিয়েছে, যা পারিশ্রমিক পাওয়ার কথা ছিল তা দেয়নি।

দেশের মাটিতে পা রেখেই টিংকু চোখমুখ শক্ত করে বলেছিল, 'এবার আমরা ঠকাব, আমরা ঠকাব মানুষকে, যাকে ইচ্ছে তাকে ঠকাব।' ঠকাতে ঠকাতে ক্লান্ত হয়ে টিংকু এখন বসে আছে, টাকার নৌকা বানাচ্ছে।

টিংকু হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে, লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ায়, তারপর আমাকে খামচে ধরে বলে, 'আমরা কি এত দিন মানুষ ঠকিয়েছি, অন্যকে ঠকিয়েছি, না আমরা নিজেরা নিজেদের ঠকিয়েছি? বল, কাদের ঠকিয়েছি—আমাদের, না

অন্যদের? আমরা আমাদের আত্মাকে ঠকিয়েছি, হৃদয়কে ঠকিয়েছি, আমরা আমাদের মানবতা-মনুষ্যত্বকে ঠকিয়েছি।'

বলতে বলতে টিংকু চিত হয়ে পড়ে ঘাসের ওপর। সন্ধ্যার আকাশ দেখতে দেখতে আস্তে আস্তে ভিজে ওঠা চোখ দুটো বুজে ফেলে সে। কী ছন্দ মিলিয়ে টাকার নৌকাগুলো ধীরে ধীরে ভেসে যাচ্ছে, ওর আর তা দেখা হয় না। কী দরকার, নিয়তি যেখানে যাকে নেবে, তাকে সেখানেই যেতে হবে।

টিংকু হঠাৎ ডুকরে ওঠে। পাশে রাখা লিজার দেওয়া মুঠোফোনটা বেজে ওঠে—...Its no sacrifice just a simple word its two hearts living in two enarate worlds but its no sacrifice no sacrifice its no sacrifice...। ফোনটা রিসিভ করে না ও, তাকায়ও না সেদিকে। ফোনটা বেজেই চলেছে, এলটন জন গেয়েই চলছেন—its no sacrifice no sacrifice its no sacrifice...।

সন্ধ্যার ম্লান আলোয় ঘাসের ওপর শুয়ে থাকা এই নিথর টিংকুকে এখন আর ঠিক ঠগবাজ মনে হচ্ছে না আমার!

---